ডিঙ্গো

রুভিম ফ্রেয়ারম্যান

ডিঙ্গো : প্রথম প্রেমের গল্প



ভাষান্তর : শামসুদ্দোহা তৌহীদ

মূল রুশ ভাষায় : রুভিম ফ্রেয়ারম্যান

রুশ থেকে ইংরেজিতে : ইরিনা ঝেলেজনোভা

ছবি এঁকেছেন : ইভান আর্খিপভ, ইউরি জোলোতভ, আ. ফনভিজিন

অনুবাদকের ভূমিকা

এক.

নীপার নদীর তীরে বেলারুশের সীমান্তবর্তী শহর ‘মোগিলেভ’। ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখে এই শহরে জন্ম নিয়েছিলেন সোভিয়েত কথাসাহিত্যিক রুভিম ইসায়েভিচ ফ্রাইয়ারমান।

ফ্রাইয়ারমানের বাবা ছোটখাটো এক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তিনি প্রায়শই তার পুত্রকে সাথে নিয়ে বনাঞ্চলে, গ্রামের বিভিন্ন বসতিতে কাজে যেতেন। ফ্রাইয়ারমানের প্রকৃতি-প্রেম নীপার নদীর তীর, বনাঞ্চল ঘিরে গড়ে ওঠে শৈশবেই। অন্যান্য বাচ্চাদের তুলনায় একটু বড়ো বয়সে স্কুলে ভর্তি করানো হয় তাকে। সাহিত্যের শিক্ষক সদোলকির অনুপ্রেরণায় তার প্রতিভার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে এবং ‘শিশুশ্রম’ নামক স্কুলপত্রিকায় তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে তিনি খারকভ প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং তৃতীয় বর্ষ শেষে ১৯১৮ সালে শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যে চলে যান।

সেখানে তিনি বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের তিনটি বছর কাটান। বিপ্লবী যুবসমাজের সঙ্গে যুক্ত হন এবং জাপানি দখলদারিত্বের সময় পার্টির গোপন কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ইয়াকভ ইভানোভিচ ত্রিয়াপিৎসিনের নেতৃত্বাধীন পার্টিজান বাহিনীর সঙ্গে তিনি সাখালিন অঞ্চলে শ্বেতরক্ষী ও বিদেশি হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

১৯২০ সালে আমুর নদীর তীরে স্বর্ণখনির কেন্দ্র বলে খ্যাত নিকোলায়েভস্ক শহরটিকে পার্টিজানরা ঘিরে ধরে এবং জাপানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। তাদের মাঝে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপরে শহরে শুরু হয় ‘লাল সন্ত্রাস’–শ্বেতরক্ষী, ধনকুবের ও প্রভাবশালী নাগরিকদের গ্রেপ্তার ও জাপানিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক হত্যাযজ্ঞ। এমনকি হাজার হাজার রুশ অধিবাসীদেরকেও হত্যা করে লাল ফৌজ। শহরের অবকাঠামো ধ্বংস ও অধিবাসীদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ–এসব সম্ভবত ফ্রাইয়ারমান প্রত্যক্ষ করেননি। ইতিহাসে এই হত্যাকাণ্ডকে ‘নিকোলায়েভস্ক ম্যাসাকার’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯২০ সালের মে মাসে ফ্রাইয়ারমান পার্টিজান বাহিনীর সঙ্গে চার মাসব্যাপী তাইগা অভিযান করে ওখোৎস্ক সাগরতীরে তুঙ্গুস আদিবাসীদের বসতিতে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তাইগা ও সায়ান পর্বতমালা অতিক্রম করে ইয়াকুতেস্ক পৌঁছান। তাঁর নাম তখন সমগ্র অঞ্চলে পরিচিত হয়ে ওঠে; পরবর্তীতে মস্কোতে বিখ্যাত লেখক আলেক্সান্দার ফাদেয়েভ-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ১৯৭১ সালে ফ্রাইয়ারমান লেখেন ‘পার্টিজান বাহিনীর অভিযানের স্মৃতি’।

অভিযানের পূর্বেই তিনি সদর দপ্তরের পত্রিকা ‘ক্রাসনয় ক্লিচ’ (লাল আহ্বান) সম্পাদনা করতেন। অভিযানের পরে তিনি দুটো সাইবেরিয়ার পত্রিকা–‘লেনস্কি কমিউনার’ ও ‘সোভিয়েত সাইবেরিয়া’-এ কাজ শুরু করেন। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ইয়ারোস্লাভৎসেভ তাঁর লেখকসত্তা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সাংবাদিকদের কংগ্রেসে মস্কো যাওয়ার সময় ইয়াকুতিয়াকে বিদায় জানান। সেই সময়ের মস্কোর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখেছেন অসমাপ্ত উপন্যাসিকা ‘ভাবনাসমূহ’।

১৯২২ সালে রোস্তা সংবাদসংস্থার সংবাদদাতা হিসেবে ফ্রাইয়ারমানকে পাঠানো হয় বাতুমিতে। সেখানেই সোভিয়েত কথাশিল্পী কনস্তানতিন পাউস্তোভস্কি-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁদের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং এবং ফ্রাইয়ারমান তাঁর দূরপ্রাচ্যভিত্তিক একটা উপন্যাসিকার খসড়া পাউস্তোভস্কিকে পাঠান। ১৯২৩ সালে ফ্রাইয়ারমানকে বাতুমি থেকে প্রত্যাহার করে মস্কোতে নিয়ে আসা হয় এবং একই বছর পাউস্তোভস্কিও চলে আসেন মস্কোতে। ১৯২৬ সালে ফ্রাইয়ারমান ‘প্রান্তজনের কথা’ পত্রিকায় যোগ দেন।

তিনি রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল, ইউক্রেন ও ককেশাস অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান; পর্যটক হিসেবে ইতালিতেও যান। সংবাদকর্মী হিসেবে তাঁর কাজগুলো পরবর্তীতে ‘সোভিয়েত পাসপোর্টে বিদেশযাত্রা’ (১৯২৬) প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২৪ সালে ফ্রাইয়ারমান কথাসাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন 'সাইবেরিয়ার আলো' পত্রিকায় 'অগ্নিয়েভকা' (শেয়াল) উপন্যাসিকা প্রকাশের মাধ্যমে। উপন্যাসিকার প্রধান চরিত্র : দরিদ্র ও অধিকারবঞ্চিত গিলিয়াক অঞ্চলের যুবক ভাস্কা–লাল বাহিনীর পক্ষে একজন দক্ষ গোয়েন্দা ও শার্পশ্যুটারে পরিণত হয় এবং নিকোলায়েভস্কে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নেয়। পরবর্তীতে উপন্যাসিকাটির পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৩২ সালে 'ভাস্কা গিলিয়াক' নামে প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিই লেখকের প্রথম বড় সাফল্য হয়ে ওঠে। তাঁর সংযত ও দৃঢ় বর্ণনাভঙ্গি এবং মানুষ, প্রকৃতি ও জটিল সময়ের উপস্থাপনা হয়ে ওঠে আরও বাস্তবসম্মত।

এই উপন্যাসিকার পর প্রকাশিত হয় গল্প 'অন্তরীপে' (১৯২৫) এবং 'সেবোল' (১৯২৬)। এসব রচনায় সরাসরি অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার প্রবণতা থেকে ধীরে ধীরে শিল্পসম্মত রচনার দিকে অগ্রসর হন।

১৯২০-এর দশকে সাইবেরিয়ার বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'সাইবেরিয়া' এবং 'প্রভাতের আলোয়' প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথমদিককার উপন্যাসিকা 'তুষারঝড়' (১৯২৬) এবং গল্প 'শুভ্র বাতাসে ভেসে ভেসে' (১৯৩১)-এ সামরিক ও বিপ্লবী শহর নিকোলায়েভস্ক-না-আমুরের বিশাল ল্যান্ডস্কেপ ফুটে উঠেছে।

এসময়কার তাঁর আরও উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ হচ্ছে : দ্বিতীয় বসন্ত (১৯৩২), নিকিচেন (১৯৩৩)।

'দ্বিতীয় বসন্ত' উপন্যাসিকাটি লেখা হয়েছিল কোলখোজের (যৌথখামার) কিশোরকিশোরীদের উপর ভিত্তি করে।

'নিকিচেন' উপন্যাসিকার মূলে রয়েছে দুই তুঙ্গুস আদিবাসী কিশোর-কিশোরীর প্রেমের গল্প। সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য পার্টিজানদের সংগ্রামের সাথে তাদের জীবন ও অনাগত ভবিষ্যৎ জড়িয়ে যায়। এখানে কমিশারের চরিত্রটি অনেকাংশেই আত্মজৈবনিক। এই উপন্যাসিকা শিশুকিশোর সাহিত্যের দিকে তাঁর অভিযাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ফ্রাইয়ারমানের খাবারোভস্ক সফরের পর ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর গল্প–অ্যান-সেনেনের দুর্ভাগ্য, ইউন ফা-ফুর মৃত্যু, নদীতে এবং প্রবন্ধ–দুই শ্যুটার।

শিশুদের জন্য রচিত অভিযানমূলক উপন্যাসিকা 'গুপ্তচর' (১৯৩৭)। গল্পে একটি কোরিয়ান ছেলের সাথে একটি রুশ মেয়ের বন্ধুত্ব দেখানো হয়েছিল।

সোভিয়েত দূরপ্রাচ্যের অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৫০-১৯৬০-এর দশকে লিখেছিলেন–প্রভাতের আলোয় (গল্প), সোনালি কর্নফ্লাওয়ার ফুল (উপন্যাসিকা)।

১৯৩২ সাল থেকে ফ্রাইয়ারমান এবং পাউস্তোভস্কির পরিবার দীর্ঘসময় ধরে রিয়াজানের সোলোতচা গ্রামে বসবাস করেন এবং তারা উভয়েই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। ফ্রাইয়ারমানের বাড়িতে প্রায়শই আসতেন বিখ্যাত সোভিয়েত কথাসাহিত্যিকেরা–আর্কাদি গাইদার, ভি. সি. গ্রসসম্যান, আ. পি. প্লাতোনভ, কনস্তানতিন সিমোনভ, আলেকজান্দার ফাদেয়েভ এবং অন্যান্যরা। এখানেই গড়ে ওঠে সাহিত্যিক ক্লাব 'কোনোতোপ'। ওকা নদীর তীরে সোলোতচা গ্রামে রুভিম ফ্রাইয়ারমান জীবনের একটা সেরা সময় কাটিয়েছেন আর্কাদি গাইদার, কনস্তানতিন পাউস্তোভস্কির সাথে।

সেই দিনগুলোর শান্তি ও সৌন্দর্য এতই গভীর ছিল যে, ১৯৩৮ সালের মে মাসে–ইয়াল্টা, বাতুমি ও আরও নানা মনোরম স্থান ঘুরে এসে, কৃষ্ণসাগরের তীরে ওদেসায় অবস্থান করেও–গাইদার সোলোতচার জন্য তীব্র বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন।

রুভিম ফ্রাইয়ারমানকে লেখা গাইদারের চিঠিতে সেই অমলিন স্মৃতিকাতরতা ফুটে উঠেছে :

প্রিয় রুভা,

তুমি কোথায়? কাকে ভালোবাসো? কাকে ঘৃণা করো? কার সঙ্গে এবং কিসের জন্য সংগ্রাম করছ? কী খাও, আর কী পান করো?

আমি ইয়াল্টা ও বাতুমিতে ছিলাম। কুতাইসিতে উড়ে গিয়েছিলাম, ফেরার পথে ওদেসায় এলাম। জাহাজের স্বল্প যাত্রাবিরতির সময় আবার ইয়াল্টার লেখক-ভবনে ঢুঁ মেরেছিলাম–সেখানে তখন আর কাউকেই পাইনি। এখন আমি সমুদ্রতীরে ছোট্ট একটা ঘরে আছি। এখানেই আমি খাই, ঘুমাই। আমি কাজও করছি। ঘাম ঝরিয়ে কোপেক উপার্জন করতেই হবে–এই হলো এক কথা।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের কাছে, মানুষের কাছে, পশুদের কাছে–চড়ুই-টুনটুনি, বুলবুলি-ছানা, এমনকি কারাস, লিন, চেবাক, ব্রিম, রোচ ও পার্চ মাছের কাছেও–নিজের অস্তিত্বকে কোনো-না-কোনোভাবে প্রমাণ করতে হয়। কিন্তু নির্বোধ রাফ মাছ কিংবা হিংস্র পাইকের কাছে আমি নিজের কোনো কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই।

ওদেসায় আমি সম্ভবত আরও মাসখানেক থাকব। এই সময়ের মধ্যেই সব কাজ শেষ করতে চাই। সমুদ্র নিঃসন্দেহে অপরূপ জায়গা–তবু রাশিয়ার জন্য মন কেমন করে! কোথায় আমার সেই দীঘি? কোথায় আমার তৃণভূমি?

কোথায় তোমরা, আমার ফুলেরা–আমার স্তেপের ফুলেরা?

আমি পৃথিবীর সব ভালো মানুষকেই ভালোবাসি। অন্যের ছোট ছোট বাড়ি, ফুলে-ভরা বাগান, নীল সমুদ্র, পাহাড়, শিলা আমাকে মুগ্ধ করে।

কিন্তু কাজবেক পর্বতের চূড়ায় আমার কিছুই করার নেই–ওঠা যায়, দেখা যায়, বিস্ময়ে স্তব্ধ হওয়া যায়, মাথা নত করা যায়–তারপর আবার নিজের শিকড়ের টান অনুভব করি–আমার প্রিয় নিজনি নোভগোরদ বা রিয়াজানের দিকে।

ইতি

আ. গাইদার

গাইদারের আরেকটা চিঠি :

প্রিয় রুভা,

তোমরা কবে সোলোতচায় যাচ্ছ? তোমার আর কোস্তার (পাউস্তোভস্কি) কী পরিকল্পনা? 'কানাভা', 'প্রোমোইনা', 'স্তারিৎসা'–সবকিছুর জন্য মন কেমন করে; এমনকি অভিশপ্ত 'পোগানয়ে' হ্রদের জন্যও।

সমুদ্রের তীরে বেরোই–এখানে তীর থেকেই 'বিচক' মাছ ধরা হয়। কিন্তু শোনো, এই মাছ শিকারে আমার কোনো আকর্ষণ নেই। বিশাল নীল সমুদ্র থেকে একইরকম, প্রায় একশো গ্রাম ওজনের একটি মাছ তুলে আনা–এ কি কোনো বিস্ময়? তারচেয়ে ঢের বেশি বিস্ময়কর সেই ছোট, স্বপ্নমগ্ন 'কানাভা'-য় দাঁড়িয়ে গর্বভরে শোনা–

'রুভা, জালটা দাও!'

আর হুকের মাথায় কী কাঁপছে–তা তো উপরে তুললেই দেখা যাবে।

আমি যখন সোলোতচায় আসব, তখন শান্ত, প্রফুল্ল ও ভাবুক থাকব। ততদিনে আমার হাতে বিস্তর টাকা থাকবে। মাতরিওনাকে দেব এক লক্ষ রুবল–যাতে আমার দেনার জন্য সে রাগ না করে; বৃদ্ধাদের দেব পঞ্চাশ হাজার; কোস্তাকে দেব তার প্রাপ্য আড়াইশো রুবল; তোমাকে দেব পাঁচ রুবল। আর সঙ্গে নিয়ে আসব দুই বস্তা শুকনো রুটি, এক পাউন্ড লবণ ও চিনির একটি বড় টুকরো। এর বেশি আমার আর কিছু দরকার নেই।

ইতি

আ. গাইদার

সোলোতচায় রুভিম ফ্রাইয়ারমান কয়েকটি গল্প এবং শিশুদের জন্য পরি-কাহিনি লিখেছেন।

সোলোতচায় লেখা হয় তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাসিকা 'বুনো কুকুর ডিঙ্গো, অথবা প্রথম প্রেমের গল্প'। উপন্যাসিকার প্রধান চরিত্রের বন্ধু ফিল্কা'র প্রোটোটাইপ লেখক তাইগার অভিযানের সময় খুঁজে পেয়েছিলেন। উপন্যাসিকাটি তিনি ১৯৩৮ সালে একমাসের মধ্যে শেষ করেছিলেন, যদিও এই গল্পের বীজ বহুবছর ধরে তাঁর মনে প্রোথিত ছিল।

রচনাটি 'লাল নবদিগন্ত' (১৯৩৯), সংখ্যা ৭ পত্রিকায় প্রকাশের পর প্রকাশনা জগতে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। কিছু সমালোচক লেখককে অভিযুক্ত করেছিলেন 'প্রাচীন প্রকৃতির দিকে ফিরে যাওয়ার রুসোবাদী আহ্বানের' জন্য, আবার অনেকে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, বইটিতে চিত্রিত হয়েছে 'মানবজীবনের প্রভাত', 'মানুষ যারা এখনও প্রভাতের সতেজতা ও সরলতা হারায়নি।'

বোরিস পোলেভয় দ্বিতীয় সর্বসঙ্ঘীয় সাহিত্যিক কংগ্রেসে এই রচনাটি সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন–'সৎ ও পরিপূর্ণ প্রেমের গল্প' হিসেবে।

আগের দূরপ্রাচ্যভিত্তিক উপন্যাসিকাগুলোর সঙ্গে এই উপন্যাসিকার পার্থক্য হলো–প্রকৃতির সন্তান, ইভেংক আদিবাসী ছেলে ফিলকা'র সরল কিন্তু দৃঢ় মননের সঙ্গে শহুরে নাগরিক কিশোরী তানিয়া সাবানেয়েভার উদ্বিগ্ন চেতনাকে বিপরীতস্থাপন করা হয়েছে। লেখক প্রকাশ করেছেন যে, যেকোনো সামাজিক ব্যবস্থায় এইসব বিরোধগুলো অনিবার্য–শৈশবের শেষ আর বয়ঃসন্ধি শুরুর জটিল মুহূর্তগুলো, প্রথম প্রেমের যন্ত্রণাপূর্ণ অভিজ্ঞতা, ভেঙে যাওয়া পরিবার এবং মানুষের সঙ্গে বুনো প্রকৃতির লড়াই।

বহুল সংস্করণের দরুন বইটি কাল্ট ক্লাসিকে পরিণত হয়। ১৯৬২ সালে পরিচালক ইউ. কারাসিক একই শিরোনামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন এবং ১৯৬৮ সালে চিত্রশিল্পী র. স্টোলিয়ারভ দুই অংশে একটি ডায়াফিল্ম তৈরি করেন।

মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই রু. ফ্রাইয়ারমান মস্কোর স্বেচ্ছাসেবী প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেন। তাঁকে ২২তম শ্যুটিং রেজিমেন্টের ৮ম ক্রাসনোপ্রেসনস্কা ডিভিশনের ৩য় সাহিত্যিক দলে যুক্ত করা হয়। ফ্রাইয়ারমানের সঙ্গে ছিলেন লিটফন্ডের সচিব স. ন. আব্রামিয়েভ, এছাড়াও সেই সময়ের পরিচিত লেখকরা–ভি. এ. আভের্যানোভ, আ. ই. রস্কিন, পি. আ. ব্লিয়াখিন, মি. ভি. লুজগিন, তরুণ ই. জি. কাজাকেভিচ এবং অন্যান্যরা। সাহিত্যিক দলে অধিকাংশ সৈন্য প্রায় প্রবীণ ছিলেন, স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগছিলেন; অনেকেই যুদ্ধের প্রথম বছরেই নিহত হন।

মহাযুদ্ধের সময় ফ্রাইয়ারমান বেশকিছু বন্ধু ও পরিচিতজন হারান–যেমন আর্কাদি গাইদার (পার্টিজান বাহিনীতে ১৯৪১ সালের ২৬ অক্টোবর নিহত) এবং আলেকজান্দার রস্কিন (১৯৪১ সালের শরতে অবরুদ্ধ অবস্থায় নিহত)।

যুদ্ধের পর তিনি ফের শিশু ও কিশোর সাহিত্যে ফিরে আসেন। 'সুদূরের পর্যটক' (১৯৪৬) উপন্যাসিকায় তিনি যুদ্ধকালীন কিশোরদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের গল্প তুলে ধরেন।

তিনি প. দি. জায়কিন-এর সঙ্গে যৌথভাবে উপন্যাস রচনা করেন–লেফটেন্যান্ট গোলোভনিনের জীবন ও রোমাঞ্চকর অভিযান (১৯৪৬-১৯৪৮)। মূল চরিত্র ছিলেন ১৯শ শতকের রাশিয়ান নাবিক ভি. এম. গোলোভনিন, যিনি দুইবার বিশ্বভ্রমণ করেছিলেন (১৮০৭-১৮১১ এবং ১৮১৭-১৮১৯) এবং জাপানিদের বন্দিত্বে দুই বছরের বেশি সময় কাটিয়েছিলেন।

প. দি. জায়কিন আরও দুটি বই-এ ফ্রাইয়ারমানের সহলেখক হন–শিশুতোষ গল্পসংকলন ‘গাংচিল’ (১৯৪৭), স্তেপানকা ও রেজভি (১৯৪৭)।

ফ্রাইয়ারমান আর্কাদি গাইদারের সৃজনশীলতা নিয়ে গবেষণা কাজের সূচনা করেন–প্রবন্ধসংকলন ‘গাইদারের জীবন ও সৃষ্টিশীলতা’ (১৯৫১) এবং শিশুসাহিত্যের প্রতি গাইদারের ভালোবাসা নিয়ে লেখা প্রবন্ধগ্রন্থ ‘শিশুদের প্রিয় লেখক’ (১৯৬৪)।

চীনা লোককাহিনির সংকলন ‘প্রিয় ফুল’ ফ্রাইয়ারমানের সংকলনে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইটির কাজের সময় ফ্রাইয়ারমান দূরপ্রাচ্যে চীনা মৎস্যজীবী ও শিকারিদের কাছ থেকে লোককথার উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় ‘সোনালি বেসিলেক’ উপন্যাস।

১৯৬৬ সালে নৈতিক ও নৈতিক-মূল্যবোধভিত্তিক গল্প ও প্রবন্ধসংকলন ‘আত্মার পরীক্ষা’ কিশোরদের জন্য প্রকাশিত হয়।

১৯৬৮ সালের জুন মাসে ফ্রাইয়ারমান পেরেদেলকিনে গুরুতর অসুস্থ কে. জি. পাউস্তোভস্কি-এর সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করেন। ‘বিদায় নেওয়ার সময় আমরা দুজনেই কেঁদেছি। তারপরও কেউ ভাবিনি যে আমাদের এই ছিল শেষ দিন,’–পরবর্তীতে এই স্মৃতিচারণ করেছিলেন লেখক তাঁর জীবনীমূলক প্রবন্ধে ‘প্রিয় বন্ধু’ (১৯৭২)।

১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ রুভিম ইসায়েভিচ ফ্রাইয়ারমান মস্কোতে মৃত্যুবরণ করেন এবং পিয়াতনিৎসকোয়ে কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

দুই.

রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) পূর্বে রাশিয়ায় শিশুদের লালন-পালনের ভার মূলত পরিবারের ওপর অর্পিত ছিল। বাবা-মাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হতো–তাঁরা সন্তানকে বাড়িতে পড়াবেন, নাকি স্কুলে পাঠাবেন। গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলোতে সাধারণত সন্তানসংখ্যা বেশি ছিল, সেখানে বড়রা প্রায়ই ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করত এবং তাদের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করত। তাছাড়া অল্পবয়স থেকেই সবাইকে মাঠের কাজ এবং গবাদিপশুর যত্ন নিতে হতো।

সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি শিশুর দায়িত্ব সরকার তার জীবনের প্রথম দিনগুলো থেকেই নিত–বলা ভালো, তারও আগে থেকে। কারণ বিশ্বে প্রথম মাতৃত্বকালীন ছুটি চালু করে সোভিয়েত রাশিয়া। সন্তান জন্মের আগে ও পরে একজন নারী কর্মচারী ভাতা পেতেন; একইসঙ্গে তাকে কাজ থেকে ছুটি দেওয়া হতো যাতে তাঁর স্বাস্থ্য কিংবা শিশুর স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি না হয়।

ষাটের দশকে মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ একবছর নির্ধারিত হয়। ছুটি শেষে কর্মজীবী মা আবার কাজে ফিরে যেতেন। কর্মস্থলে তিনি প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর শিশুকে স্তন্যদানের জন্য বিরতি পেতেন। কারখানাগুলোতে ডে-নার্সারি বা শিশুসদন থাকত, যাতে স্তন্যদানকারী মায়েরা অল্প সময়ের জন্য হলেও কাজের জায়গা ছেড়ে এসে সন্তানকে খাওয়াতে পারেন। প্রতিবার বাচ্চাকে স্তন্যদানের পূর্বে মায়েদের জন্য উষ্ণ পানীয়, দুগ্ধ ও খাবারের সরবরাহ করা হতো।

কর্মজীবী নারীদের জন্য এসব ব্যবস্থা তার কাজের জন্য অত্যন্ত অনুকূল ছিল। কারণ সাম্রাজ্যবাদী যুগে সন্তান জন্ম দেওয়ার পর একজন নারীকে চাকরি ছেড়ে দিতে হতো। তার জন্য কোনো বিশেষ বিবেচনা করা হতো না।

তিন বছর বয়সে শিশুদের কিন্ডারগার্টেনে পাঠানো হতো এবং তা পুরোপুরি অবৈতনিক ছিল। ছয় বছর বয়সে ভর্তি করা হতো সাধারণ বিদ্যালয়ে। বিপ্লবের এক বছর পর, অর্থাৎ ১৯১৮ সালে, রুশ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে একটি আইন পাস করা হয়। যারা তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে ব্যর্থ হতেন, সেই অভিভাবকদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হতো–প্রয়োজনে সামাজিক সেবাদপ্তর কর্তৃক শিশুকে পরিবার থেকে সরিয়ে নেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ গৃহযুদ্ধের সময় বহু শিশু বাবা-মা হারায়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী তখন প্রায় সত্তর লক্ষ গৃহহীন শিশু ছিল, যার মধ্যে মাত্র প্রায় ত্রিশ হাজার শিশু এতিমখানায় ছিল। অনেক শিশু রাস্তায় বড় হয়ে উঠত, চুরি-ভিক্ষা করত এবং পরবর্তীতে আরও বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়ত। রাষ্ট্র এই সমস্যার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিল–শিশুদের নিবন্ধন করা, খাদ্য, আশ্রয় ও পোশাক সরবরাহ করা। এজন্য বিশেষ শিশু কমিশন গঠন করা হয় এবং বিপুলসংখ্যক এতিমখানা ও সংশোধনমূলক বিদ্যালয় খোলা হয়।

সোভিয়েত শিক্ষানীতি প্রস্তুতকালে শিক্ষাবিদ আন্তন মাকারেঙ্কো-র অবদান অপরিসীম। মাকারেঙ্কো কাজকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক বিকাশের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতেন। তাঁর মতে, সব শিশুকেই শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা উচিত এবং তাদের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া দরকার, যাতে তারা নিজেদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতা বুঝতে শেখে।

১৯২০-এর দশকের শেষ নাগাদ সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান প্রেরণা ছিলেন নাদেজদা ক্রুপস্কায়া। তিনি ছিলেন লেনিনের স্ত্রী ও শিক্ষাবিষয়ক উপ-জনকমিসার। তিনি বলতেন, ‘স্কুল কেবল পাঠদান করবে না বরং কমিউনিস্ট মানস গঠনের কেন্দ্র হওয়া উচিত।’ তিনি মাকারেঙ্কোর কিছু পদ্ধতির সঙ্গে মতবিরোধ করলেও আত্মশাসন ও শিক্ষার্থীদের দ্বারা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকত্বের নীতি সমর্থন করতেন।

১৯২২ সালে শিশুদের জন্য পাইওনিয়র সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নাদেজদা ক্রুপস্কায়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সংগঠনটির উৎপত্তি হয় রুশ স্কাউট আন্দোলন থেকে, যার সূচনা হয়েছিল ১৯০৮ সালে দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনামলে। তবে কাঠামোগত দিক থেকে স্কাউটদের সঙ্গে মিল থাকলেও, পাইওনিয়র আন্দোলনের বিষয়বস্তু ছিল ছাত্রছাত্রীদেরকে আদর্শ ও কমিউনিস্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। স্কুলের ১০-১৪ বছর বয়সি ছাত্রছাত্রীদের পাইওনিয়র হিসেবে গড়ে তোলা হতো।

আরও ছোটদের সংগঠন হিসেবে চালু ছিল ‘লিটল অক্টোব্রিস্ট’ (ক্ষুদে অক্টোবরপন্থি)। সাত বছর বয়সি শিশুরা লিটল অক্টোব্রিস্ট হতে পারত।

সমগ্র সোভিয়েত রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল ১৫টি প্রজাতন্ত্র ও শতাধিক জাতি এবং অধিজাতির সমন্বয়ে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের মূলনীতি : জনগণের ঐক্য, সমতা, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা। আর এই মূলনীতির ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ।

রুশ বিপ্লবের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল একটা নতুন মানবসমাজ আর এই মানবসমাজের প্রতিটি জাতির ব্যতিক্রমহীন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সোভিয়েত দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্যবাদী ভবিষ্যত রচনা।

এই বৈশিষ্ট্য সহজাত নয়, আর তাই এই বোধ সবার মধ্যে জাগ্রত করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল ‘নিখিল ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লিগ’ (কমসোমল)। ১৪-২৮ বছর বয়সি যুবক-যুবতীরা কমসোমলের সদস্য হতে পারত।

কমসোমলের গুরুত্বপূর্ণ নীতি : জাতিগত বা বর্ণগত ঘৃণা সম্বন্ধে অসহিষ্ণু এবং সকল দেশের জাতির মেহনতি মানুষের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সংহতি।

পাইওনিয়রদের মধ্যে যারা বড় হয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সক্রিয় হতে চেয়েছিল, তারা প্রায়শই কমসোমলে যোগ দিত। যুবসমাজের জন্য পাইওনিয়র সংগঠন একটি 'প্রস্তুতিপর্ব' হিসেবে বিবেচিত হতো, যেখানে বয়স অনুযায়ী দায়িত্ব ও স্বাধীনতা বাড়ত।

কমসোমলরা পাইওনিয়রদের জন্য প্রমোদবিহার ও পায়ে হেঁটে ভ্রমণ, মৈত্রী ট্রেন প্রভৃতিরও আয়োজন করত। এতে ছাত্রছাত্রীগণ অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের ছাত্রছাত্রীগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেত।

কমসোমলের উদ্যোগে প্রতিবছরই ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে নির্মাণকর্মীদল গঠিত হতো। গ্রীষ্মকাল এলেই হাজার হাজার শিক্ষার্থীর বড় বড় দল দেশের সকল অংশে ছড়িয়ে পড়ত। তারা বিশ্রাম বা আমোদ-প্রমোদের জন্য যেত না। তাদের গন্তব্য বিভিন্ন নির্মাণক্ষেত্র, যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামার।

বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে উপার্জিত অর্থ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় তহবিলে দান করত সোভিয়েত দেশের সাধারণ জনগণের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা না ভেবে সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির সমৃদ্ধিতে সাহায্য করার এই মহতী উদ্যোগকে বলা হতো 'কমিউনিস্ট সুব্বোৎনিক'। ভি. আই. লেনিন এই সুব্বোৎনিক সম্পর্কে বলেছিলেন 'সাম্যবাদের সত্যিকার সূচনা'।

পাইওনিয়ররা বয়স্ক ও একাকী মানুষদের দায়িত্বও নিত। দেশের সামাজিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করত। 'লাল রঙের স্কার্ফ' ছাড়াও সমগ্র পাইওনিয়র আন্দোলনের প্রধান 'আইকন' ছিলেন ভ্লাদিমির লেনিন। পাইওনিয়রদের ব্যাজে অলংকৃত লেনিনের ছবির নিচে লেখা থাকত তাদের মূলমন্ত্র : সদা প্রস্তুত!

তিন.

বুনো কুকুর ডিঙ্গো বা প্রথম প্রেমের গল্প–উপন্যাসিকার পটভূমি বিস্তৃত সাইবেরিয়া অঞ্চল যেখানে বয়ঃসন্ধিকালীন তিন কিশোরকিশোরীর প্রেম ও বন্ধুত্বের জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে ঔপন্যাসিক ও শিশুসাহিত্যিক রুভিম ফ্রাইয়ারমান চমৎকার এক সোভিয়েত ক্লাসিক উপহার দিয়েছেন আমাদের।

গল্পের প্রোটাগনিস্ট তানিয়া, যাকে ডিঙ্গো নামেই ডাকত সবাই, শৈশবে বাবা-মা আলাদা হয়ে যাওয়ায় পিতৃহীনভাবে বেড়ে ওঠে সে। পরবর্তীতে তার বাবা আবার ফিরে আসায় তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এক টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে, পাশাপাশি তানিয়া তার স্কুলের দুই বন্ধুর সাথে প্রেম ও বন্ধুত্বের এক জটিল সমীকরণের মধ্যে আটকে পড়ে।

তবু, সমস্ত চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এই গল্প সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা।

এই গল্পে সোভিয়েত সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা, পাইওনিয়র সংগঠন উঠে এসেছে যা ভূমিকায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। উপন্যাসের পটভূমি বুঝতে আশা করছি প্রিয় পাঠকদের সহায়তা করবে।

উপন্যাসটি অনুবাদে ও রুশ সংস্করণ থেকে ইলাস্ট্রেশনগুলো দিয়ে সাহায্য করেছেন আমার সহ-লেখক, বন্ধু ইয়েভগেনি ভিক্টরোভিচ স্পিরিন। অপরিসীম কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতি।

ডিঙ্গো : প্রথম প্রেমের গল্প–বইটা পুনঃপ্রকাশের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ধী প্রকাশনীর কাছে।

প্রিয় পাঠকদের জন্য রইল একরাশ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

শামসুদ্দোহা তৌহীদ

বরিশাল

জানুয়ারি, ২০২৬

এক

ছিপ পড়ল নদীর জলে। বালুচরে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ি দুলে উঠল ঢেউয়ের তালে।

ট্রাউট মাছ ধরছিল মেয়েটি।

একটা বড়সড়ো পাথরের চাঙড়ে চুপ করে বসে আছে সে। নদীর কলতান চারপাশে সুর তোলে। শেষ বিকেলের সোনাগলা রোদ নদীর ঢেউয়ে ঝিলমিল করে। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তাই আনমনে তার চাহনি সরে যায় দূর থেকে দূরে। নদীতীর ঘেঁষে থাকা পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের উপরে ঢেউ খেলানো সবুজ বনানীতে। নদীর জলে ভাসে তাদের ছায়া।

সূর্যাস্তের নরম আলোয় পাহাড় ঘেরা আকাশকে উপত্যকা বলে ভ্রম হয়। কিন্তু আজকের আকাশ তার কাছে বড় অচেনা। করতালের মতো চেনা শৈশবের আকাশ কেমন করে যেন বদলে গেল। সে অপলক দৃষ্টিতে চির বহমান এ নদীকে নতুন করে দেখছে। এ নদীর জন্ম কোথায়?কোথায় কোন তেপান্তরে বয়ে চলেছে? তার খুব ইচ্ছে হয় নতুন মুলুকে যেতে, অদেখা ভুবন দেখতে, যেখানে 'ডিঙ্গো' নামের অস্ট্রেলিয়ান বুনো কুকুর দেখা যায়। তার কত দিনের প্রতীক্ষা বৈমানিক হওয়ার! সংগীতশিল্পীও হতে ইচ্ছে করে।



রিনরিনে সুরে সে গাইতে শুরু করল, এরপর কিছুটা জোরালো স্বরে,

‘ও নদীরে, একটা কথা শুধাই শুধু তোমারে,

বলো কোথায় তোমার দেশ,

তোমার নেই কি চলার শেষ!

ও নদীরে...’

তার কণ্ঠ বেশ সুরেলা। কিন্তু বাহবা দেওয়ার জন্য পাশে কেউ নেই। হঠাৎ চকিত হয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিলো গাছের গুঁড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটা জল-ইঁদুর।

কাছেই নলখাগড়ার বন। সাঁতরে তীরে উঠে নলখাগড়ার ঘনপাতার মধ্য দিয়ে পালাতে যেয়ে এটার বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। গান থামিয়ে করুণাভরে তাকায় মেয়েটি। আস্তে করে তুলে ধরে এটাকে চলার পথে নামিয়ে দিলো। ইঁদুরটি সভয়ে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ছুটল। হঠাৎ বাদামি ফুটকির ট্রাউট মাছ ঢেউয়ের চূড়া ছুঁয়ে আবার ডুব দিলো গভীর জলে।

অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়েছিল মেয়েটি। দেওদার গাছের বনের মধ্যে এক সময় টুপ করে ডুবে গেল। বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু ব্যস্ততা নেই আজ। অলসতায় কোনোরকমে নিজেকে টেনে তুলল পাথরের চাঙড় থেকে। পাহাড়ের ঢাল যেখানে শেষ, সেখান থেকেই ঢেউ খেলানো বনের শুরু। সে ধীরলয়ে বনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। পাথুরে নদীতটে ভেঙে পড়া কলকল ধ্বনি ধীরে ধীরে ম্লানিমায় হারিয়ে যায়। বিজন বনের নিস্তব্ধতা গ্রাস করে তাকে। হঠাৎ পাইওনিয়রদের বিউগলের সুর অখণ্ড নীরবতাকে ভেঙে খান খান করে ফেলল। অক্ষৌহিণীর মতো সারি সারি দেওদার গাছের মাঝ দিয়ে গমগম করে রণসুর। এখন আর দেরি করা চলে না। তবুও সে ধীর কদমে হাঁটছিল। সামনেই এক চিলতে জলাভূমি। তাতে কী সুন্দর হলুদ হলুদ মার্শলিলি ফুটে আছে! সে উবু হয়ে বসে মূলসহ কিছু মার্শলিলি তুলল। দু’হাতভর্তি ফুল নিয়ে আবার যখন হাঁটতে শুরু করল, মৃদু পায়ের আওয়াজ শুনল তখন। কেউ একজন তাকে ডাকল, ‘তানিয়া।’

মেয়েটি সাথে সাথে ঘুরল পিছন ফিরে। ফিল্কা কাছেই একটা পিঁপড়ের ঢিবির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ইশারায় ডাকল তানিয়াকে। ফিল্কা জাতিতে একজন নানাই।

তানিয়া হাসিমুখে এগুলো তার দিকে। মস্ত এক গাছের গুঁড়ির ওপরে কৌটোভরা কাউবেরি রাখা। ফিল্কা পাশেই ইয়াকুত ছুরি দিয়ে বার্চ গাছের ডাল ছাঁটাই করছিল।

‘তুমি বিউগলের বাজনা শোনোনি?’ জিজ্ঞেস করল ফিল্কা। ‘আজ তাড়া নেই মনে হচ্ছে!’

‘ঘুরতে বের হয়েছি,’ তানিয়া বলল। ‘কিন্তু মায়ের হাসপাতালে ডিউটি, তাই আসতে পারেননি, আর ক্যাম্পে আমাকে কেউ মনেও করে না।’মুচকি হেসে আরও বলে চলল, ‘কিন্তু তোমারও আজ তাড়া নেই মনে হচ্ছে।’

‘ঘুরতে বের হয়েছি,’ ওর সুর নকল করল ফিল্কা।‘বাবা বাথান থেকে আমায় দেখতে এসেছিলেন, তার চলে যাওয়ার সময় একবার ভেবেছিলাম টিলার ওপরে দেওদার গাছের বন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব কিনা?’

‘গিয়েছিলে শেষ পর্যন্ত?’

‘না, যাব কেন?’ বুক চিতিয়ে জবাব দিলো ফিল্কা। ‘বাবা আজকে ক্যাম্পের পাশেই নদীর কাছে থাকবেন, মহাশিলার পিছনে স্নান করেছি আজ, এরপর তোমার খোঁজে গিয়েছিলাম। তুমি গান গাইছিলে তখন।’

তানিয়া তার অপাঙ্গে চেয়ে হেসে ফেলল। আরক্তিম হয়ে উঠল ফিল্কার মুখ।

‘যেহেতু তোমার যেতে দেরি হচ্ছে, একটু দাঁড়াও। তোমার জন্য নেমন্তন্ন আছে।মিষ্টি মিষ্টি পিঁপড়ের শরবত।’

‘আবার নেমন্তন্ন! সকালেই তো তোমার দেওয়া কাঁচা মাছ খেলাম।’

‘মাছ আর পিঁপড়ের শরবত কি এক? এটা খেয়ে দ্যাখো,’ এই বলে ফিস্কা তার হাতে ধরা ডাল পিঁপড়ের ঢিবির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো।

খানিকক্ষণ পরেই পিলপিল করে পিঁপড়ের সারি বেরুল ডাল বেয়ে। বাকল ছাড়ানো আঠালো জায়গায় আটকে গেল একসময়। ফিস্কা গাছের গুঁড়ির ওপর ডাল হাতে নিয়ে পরপর কয়েকটা ঝাঁকুনি দিলো আর তাতেই সবগুলো পিঁপড়ে ঝরে পড়ল। ডালের গায়ে বিন্দু বিন্দু পিঁপড়ের লালা জমে আছে। ফিস্কা একটু চেটে নিয়ে তানিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিলো ডালটি। ডালটি ওপরে ধরতেই কয়েক ফোঁটা পিঁপড়ের লালা পড়ল তানিয়ার মুখে।

‘এত মজা লাগে খেতে! পিঁপড়ের শরবত আমার সবসময়ই ভালো লাগে।’

সে আবার বনপথে হাঁটতে আরম্ভ করল। ফিস্কাও চলল তার পিছুপিছু।

দু’জনেই নীরবে পথ চলছিল। কে জানে হয়তো, মৌনী বনের অতিথিরাও নীরবতা ভালোবাসে।

এমন বিষাদমাখা সন্ধ্যায় তানিয়ার মন কেমন করে। আর ফিস্কাও পিঁপড়ের শরবত ব্যতীত কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ মেরে গেল। বাকি পথটুকুতে আর আলাপ হলো না। পাহাড়ঘেঁষা সড়কের শেষ মাথায় পৌঁছাল তারা। এখান থেকেই তাদের ক্যাম্প দেখা যায়। বনের প্রান্তসীমায় সারি সারি তাঁবু খাটানো হয়েছে। কাছেই একটা খাড়াই পাহাড়। আর এর কোলঘেঁষে বয়ে চলেছে নদীর মোহনা।

ক্যাম্প থেকে বাচ্চাদের শোরগোল শোনা যাচ্ছে। পাহাড়ঘেরা এ আদিম নির্জনতার মাঝে তানিয়ার কাছে তা দূরাগত বন মর্মরের মতোই বাজে।

‘সম্ভবত নাম ডাকা শুরু হয়েছে,’ তানিয়া বলল।‘আমাদের এক সাথে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি যাওয়ার পরেই তুমি এসো। না হলে সবাই আমাদের নিয়ে হাসবে।’

এটা শুনে আহত বোধ করল ফিস্কা।

‘তুমি ওরকম করে ভাবলে কেন?’ ভাবতে ভাবতে লতানো ঝোপের উতরাই বেয়ে সে রাস্তায় লাফ দিলো। তানিয়া ভয়ে দম বন্ধ করে রইল।

অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ফিস্কা পথ চলা শুরু করল। আর তানিয়া নিচু নিচু পাইন গাছের সারির মাঝ দিয়ে ঘুরপথে চলতে লাগল। একসময় সে এসে পড়ল ঝা-চকচকে সড়কে। বনের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা এ যেন এক ঝিলমিল নদী। একটা যাত্রী বোঝাই বাসগাড়ি ভুস করে তার সামনে দিয়ে চলে গেল। যাত্রীরা গাড়ির জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে হল্লা করছিল। এরা সবাই চড়ুইভাতি শেষে শহরে ফিরছে। চেনা কে আর এই বাসে থাকবে, এটা ভেবে বাসের বিষয়টা আর আমলে নিল না। সড়ক পার হয়ে খানাখন্দভরা এবড়োখেবড়ো জমি। আর জমিটা পার হয়েই ক্যাম্পের মাঠ। সে দৌড়ে মাঠে চলে এলো।

মেয়েরা হইচই করে ঘিরে ধরল তাকে। পতাকা পতপত করে উড়ছে। ফুলগুলো কোনোরকমে নিচে ফেলে রেখে সারিতে দাঁড়াতেই সে পাইওনিয়র দলপতি কস্তিয়ার কড়াদৃষ্টির সামনে পড়ল।

‘তানিয়া সাবানেয়েভা, নাম ডাকার সময়ে দেরি করা চলবে না।’এরপর সবার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘পাইওনিয়র! সাবধান হবে, সাবধান!’

কাঁধ ঝাঁকাল তানিয়া। ‘ডাইনে যদি থাকে বন্ধু, ভালো লাগে তখন। বাঁয়েও যদি থাকে বন্ধু, ভালো লাগে আরও। দুইপাশেই যদি বন্ধু থাকে, তবে দিনটাই পয়মন্ত।’সে ভাবল।

ফিল্কা তার ডান পাশেই দাঁড়িয়ে। তার মুখ ভিজা পাথরের মতো চকচক করছে, রুমালটাও ভিজে জবজবে।

'ফিল্কা, তুমি কেমন ধারার পাইওনিয়র!' কস্তিয়া বলে চললেন, 'একজন পাইওনিয়রের প্রতিবার গোসলের পরে তার লাল রুমাল যদি ভিজা ন্যাকড়ার মতো দেখায়, এটা কি তার জন্য গর্বের বিষয় হবে? মিথ্যে বলার চেষ্টা করো না। আমি তো সব বুঝি। দাঁড়াও, আমি তোমার বাবার সাথে কথা বলব।'

'বেচারা ফিল্কা!' তানিয়া মনে মনে বলল। 'আজ ওর ভাগ্যটাই খারাপ।'

সারিতে দাঁড়িয়ে সে সোজা কস্তিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। কারণ প্রথমত সে নিয়ম ভাঙ্গতে চায় না, দ্বিতীয়ত তার পাশে গোলগাল দেখতে একটা মেয়ে দাঁড়ানো। তার নাম ঝেনিয়া। তাকে অতটা ভালো লাগে না তার, তাই তার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছিল না।

পঞ্চমবারের মতো এবার সে গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে। আগের মতো অত উচ্ছ্বাস লাগে না। আগেকার দিনগুলোতে সে জেগে উঠত সাতসকালে। পথের দু'পাশে কাঁটাগাছের ঝোপ দেখে মুগ্ধ হতো। শ্যামল বরণ পাতা চুয়ে ঝরত শিশির। ভালোবাসত ড্রামের টিপ টিপ বাজনা। পিঁপড়ের শরবত। ক্যাম্পফায়ারের চারপাশ ঘিরে সবাই মিলে গানের কলি খেলা। এ সবই ভালোবাসত।

তাহলে এখন কী হলো তার? কী সব অনাসৃষ্টি ভাবনা বয়ে যায় আজ! হতচ্ছাড়া নদীটার দোষ সব। মনে তার কু ডাকে। জানে না কেন উড়ুউড়ু করছে মন। কেনই-বা অস্ট্রেলিয়ান বুনো কুকুর ডিঙ্গোকে দেখতে ইচ্ছে হয়। মনের বয়স বাড়ল কি একটু?

নাম ডাকার পুরো সময়টায় ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ক্যাম্পের ক্যান্টিনে রাতের খাবারের সময়েও ভাবনার গণ্ডি ছেড়ে বেরুতে পারে না। চিন্তার সুতো ছিঁড়ে যায় ক্যাম্পফায়ারের প্রস্তুতির কাজে।(যদিও তার বন্ধুরা এ কাজে বেশি পারদর্শী!)

সে বনে যায় লাকড়ি সংগ্রহের জন্য। ফিরে আসে ঝড়ে ভেঙে পড়া বার্চের ডাল নিয়ে। স্তূপ করা লাকড়ির ওপরে বার্চের ডাল রেখে সে আগুন ধরায়। চারপাশে একটা নালা কাটে ফিল্কা। আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তাই এই সুরক্ষা ব্যবস্থা। এরপর চুপচাপ অপেক্ষা করে যতক্ষণ-না পর্যন্ত স্তূপের সবচেয়ে নিচের ডালে আগুন ধরে। ধিকিধিকি আগুন জ্বলে।

বার্চের সাদা ডাল আগুনের সোনালি শিখায় পুড় পুড় করে পুড়ছে। এ ডালের আগুনে ফুলকি হয় না। চারপাশে প্রদোষের আঁধার গাঢ় হয়ে আসে। অন্য স্কোয়াডের বাচ্চারা এসেছে ক্যাম্পফায়ার দেখতে। তাদের চোখেমুখে খুশির ঝিলিক।

পাইওনিয়র দলপতি কস্তিয়া এসেছেন।ক্যাম্পের ডাক্তার, এমনকি তত্ত্বাবধায়কও এসেছেন। নাচ-গান কেন হচ্ছে না তা জিজ্ঞেস করলেন তত্ত্বাবধায়ক। এরপরে বাচ্চারা সবাই গান গাইল। কিন্তু তানিয়া তাতে অংশ নিল না। চোখ বড়বড় করে আগুনের শিখা দেখছিল সে। নদীর মতোই এ আগুন। নিশ্চলা নয়। দাউদাউ করে ধাবমান হয় যেন আকাশ ছুঁতে চায়। আগুনেরও ভাষা আছে। সেই ভাষা সুর তোলে তার মনে।

তানিয়ার বিষণ্ণ মুখ ফিল্কা সহ্য করতে পারে না। কৌটোভরা কাউবেরি নিয়ে সে আগুনের পাশে বসল। এই আশায় যদি সে তার মন ভালো করে দিতে পারে। ফিল্কা বড় দেখে কিছু কাউবেরি তানিয়ার হাতে ধরিয়ে দিলো। বেরিগুলো পাকা টসটসে। তানিয়া বেশ স্বাদ নিয়ে খেল।

তার ফুরফুরে মেজাজ দেখে ফিল্কা বাচ্চাদের নিয়ে ভল্লুকের কীর্তি-কলাপের গল্প শুরু করল। সে শিকারীর পুত্র। তাই জঙ্গলের গপ্প তার থেকে ভালো আর কে ফাঁদতে পারে!

কিন্তু তানিয়া বাধা দেয়।

‘আমার জন্ম এখানেই, বড়ও হয়েছি এখানে।কিন্তু আমি বুঝি না কেন সবাই শুধু ভালুকের গল্প বলে?’

‘কারণ তাইগায় থাকে শুধু ভালুক আর ভালুক,’ মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিলো ঝেনিয়া। সে ভাবনাচিন্তার ধার ধারে না। উত্তর তার কাছে তৈরি হয়েই থাকে।

তানিয়া তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। সে ফিল্কাকে জিজ্ঞেস করল অস্ট্রেলিয়ান বুনো কুকুর ডিঙ্গো সম্পর্কে কিছু জানে কিনা। ফিল্কা হাস্কি সম্পর্কে জানত, কিন্তু ডিঙ্গো সম্পর্কে কিছু বলতে পারল না। উপস্থিত বাকিরাও কিছু জানে না।

‘তুমি ডিঙ্গো নিয়ে জানার জন্য এত উতলা কেন?’ খেদের সাথে ঝেনিয়া বলল।

তানিয়া কিছু না বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বার্চের কাঠ দাউদাউ করে জ্বলছিল। হঠাৎ করে তার দীর্ঘশ্বাসের সাথেই যেন তা জান্তব হয়ে ওঠে। হঠাৎ মনে হলো শূন্য থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এলো, ‘এই যে আমার ছোট্ট বন্ধুরা, ভয় পেলে কেন?’ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষায় বলল। একটা ভৌতিক কালো হাত যেন উঠে এলো আঁধার থেকে। ফিল্কার মাথার ওপর দিয়ে সেই হাত নিভু নিভু আগুনে ছুড়ে দিলো ঝোপঝাড় থেকে আনা এক আঁটি সরু সরু ডাল। এক প্রস্থ আঁধার যেন টুটে গেল চাগিয়ে তোলা আগুনে। অগুনতি ফুলকি চাপা গর্জনে ছড়িয়ে পড়ল রাতের আঁধারে, আর ছড়িয়ে পড়া মিটমিটে আলো যেন নেমে আসা নক্ষত্রখচিত একফালি আকাশ।

বাচ্চারা লাফিয়ে পিছনে সরে এলো। আর আগুনের সামনে দেখা গেল এক বেঁটে রহস্যময় লোককে। তার হাঁটুতে চামড়ার আচ্ছাদন বাঁধা,আর মাথায় পরে আছে বার্চের বাকল দিয়ে তৈরি টুপি।

‘ফিল্কার বাবা! ফিল্কার বাবা!’ তানিয়া চমকে উঠে বলল। ‘ইনি একজন শিকারী। আমি তাকে চিনি। আমার প্রতিবেশী। এখন ক্যাম্পের কাছাকাছি থাকেন।’

শিকারী তানিয়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গা দুলিয়ে হাসলেন। বাচ্চাদের সামনে দাঁড়িয়ে তার আকর্ণবিস্তৃত হাসিতে সামনের পাটির কিছু ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত উদ্ভাসিত হয়। দীর্ঘদিন তামার পাইপ টেনে টেনে এ দশা হয়েছে। জ্বলন্ত অঙ্গারে পাইপটা ছুঁয়ে কিছুক্ষণ পরপর টানেন আর ফুঁ দিয়ে শিসের মতো শব্দ করে ধোঁয়া ছাড়েন। তাকে দেখলে মনে হয় কোনোদিন কুৎসিত ভাবনা তার মনে আসেনি। সত্যিকার মানুষ যেমন হয় আর কি!

কিছুক্ষণের মধ্যে কস্তিয়া এসে ঘোষণা দিলেন যে, বাইরের লোক ক্যাম্পে থাকতে পারবে না। তখন প্রতিবাদের রোল উঠল চারপাশে।

‘সব ঠিক বলেছেন কস্তিয়া,কিন্তু ইনি ফিল্কার বাবা। তার মতো মজার মানুষ আর কয়জন আছে! তাকে আমাদের সাথে থাকতে দিন।’

‘আপনি ফিল্কার বাবা?’ কস্তিয়া জিজ্ঞেস করলেন। ‘তাহলে ঠিক আছে, আমি আপনার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কমরেড। আপনার পুত্র, ফিল্কা, নিজে কাঁচা মাছ খায়, আবার অন্যদেরকেও জোর করে খাওয়ায়। ওদের মধ্যে তানিয়া সাবানেয়েভাও আছে। আর আমরা চাই না তার লাল রুমাল ভিজা ন্যাকড়ার মতো দেখাক। সে মহাশিলার কাছে গোসলে যায়। বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও এগুলো করেছে সে।’কথাগুলো বলে কস্তিয়া বাকি ক্যাম্পফায়ারগুলো দেখতে বেরুলেন।

শিকারী যদিও কস্তিয়ার সব জ্ঞানগম্যি কথা বোঝেননি, তারপরও তিনি বারবার মাথা নাড়ছিলেন তার প্রতি সম্মান রেখে।

‘ফিল্কা, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি বনের পশু মারি যাতে দুটো পয়সা রোজগার করতে পারি, আর তা দিয়ে তোমাকে একটা ভালো শহুরে স্কুলে পড়াতে পারি, তোমার ভালো খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি। আর তুমি এই

একদিনে এত বদমায়েশি করে ফেলেছ! এতে তোমার আখেরে লাভ কী হবে? এখন একটু কাজের কাজ করো, ল্যাসোটা ধরো। জঙ্গলে আমার বল্গাহরিণটা আছে, ওটাকে ধরে নিয়ে আসো। আমি সারারাত এখানে আছি,' এই বলে চামড়ার ফিতে বার করলেন।

ফিল্কা উঠে দাঁড়িয়ে সবার দিকে তাকাল, এই আশায় যদি তার শাস্তির ভাগ কেউ বহন করে। তানিয়ার বড্ড খারাপ লাগল ওর জন্যে। সে তাকে কাঁচা মাছ খাওয়াল, সাথে পিঁপড়ের শরবত, সম্ভবত তারই জন্য মহাশিলার পিছনে গোসল করতে গিয়েছিল। তানিয়া উঠে দাঁড়াল।

'আমি তোমার সাথে যাব, ফিল্কা। বল্গাহরিণের খোঁজ করে তাড়িয়ে নিয়ে আসব তোমার বাবার কাছে।'

দুজনেই ছুটল বনপথে। বন নীরবে তাদের স্বাগত জানায়। শ্যাওলা ভরা বনে ফার গাছের দীঘল ছায়া পড়ে, আর চাঁদের আলোয় চকমক করছে স্পার্জ লরেল ঝোপে ঝুলে থাকা বেরি ফলের থোকা। কাছেই বল্গাহরিণ ফার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ডালে জমা শ্যাওলা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। ভীতু চোখে তাকায় এটি, তাই ফিল্কার ল্যাসো ছোঁড়ার প্রয়োজন হয়নি। শিশিরভেজা ঘাস মাড়িয়ে তানিয়া লাগাম ধরে হরিণটিকে টেনে নিয়ে গেল বনের প্রান্তসীমায়।

শিকারী তাদের দেখে উৎফুল্ল হলেন। উপহারস্বরূপ পাইপ সাধলেন তানিয়াকে। ব্যাপারখানা দেখে বাচ্চারা খিলখিল করে হেসে ফেলল।

'পাইওনিয়ররা ধূমপান করে না, বাবা। নিষেধ আছে,' জোর দিয়ে বলল ফিল্কা।

শিকারী ভীষণ অবাক হলেন। কিন্তু এটা ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে, সে অজ্ঞ হলেও তার পুত্র ঠিক পথেই আছে। না, তিনি নিজে শহুরে স্কুলে পড়েছেন, না লাল রুমাল বেঁধেছেন। তিনি তানিয়ার কাঁধে হাত রেখে নিশ্চিন্ত মনে পাইপ টানতে লাগলেন। বল্গাহরিণটি তানিয়ার মুখে উষ্ণ দম ছাড়ছিল, আর এটার শিং দিয়ে কিছুক্ষণ পরপর তার পা ঘষছিল। তানিয়া সানন্দে এটার গলা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ল নরম ঘাসের বনে। পুরো মাঠ জুড়ে অনেক ক্যাম্পফায়ার জ্বলছে, বাচ্চারা গান গায়, আর ক্যাম্পের ডাক্তারবাবু চতুর্দিকে ঘুরেফিরে দেখছিলেন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ল কিনা!

'কী আনন্দ চারপাশে! তবুও ডিঙ্গোকে খুঁজে পেতে চাই,' তানিয়া ভাবল।

কিন্তু নদী তাকে এখনো ডাকে, নদীতীরে ভেঙে পড়া কল্লোলের সুর ভেসে আসে। কেন এমন করে চাইছে সে একটা কিছু ঘটুক, যাতে তার জীবন ওলটপালট হয়ে যায়?

****

দুই

গতকালের তোলা মার্শলিলি এখনো শুকিয়ে যায়নি। ভেজা ঘাস আর শ্যাওলা দিয়ে লিলিগাছের শিকড় এবং বার্চের বাকল দিয়ে কাণ্ড তানিয়া কাল রাতেই মুড়ে রেখেছিল।

হাতে ফুল আর কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে সাচ্চা পর্যটকের মতো সে বেড়াতে যেত একসময়। কিন্তু চাইতে-না-চাইতেই সবকিছু দ্রুত বদলে যায়। গত কয়েক রাত্তিরে ঠান্ডা পড়ায় ক্যাম্পের পাততাড়ি গোটানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। না হলে তো সবার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে বিপত্তি বেঁধে যাবে। শরৎকাল এসে গেছে। গ্রীষ্ম মরশুমের ফুল শেষ প্রায় সপ্তাহখানেক হবে। প্রতিদিন সকালে উঠেই দেখা যায়, তাঁবুর কাপড়ে মুক্তার দানার মতো জমে আছে শিশিরবিন্দু। মাঝ বেলাতে এসেও গাছের পাতা আর ঘাসের ডগায় টলমল করে শিশিরের ফোঁটা।

শহর খুব বেশি দূরে নয়, গত রাতেই বাসে চেপে অনেকে এদিকটায় চড়ুইভাতির জন্য এসেছিল। বনকে এফোঁড়ওফোঁড় করে দিয়েছে আনকোরা মসৃণ সড়ক, তবুও সারাপথে ধুলার আস্তরণ। সাদা গুঁড়োর মতো ধুলায় ছেয়ে গেছে ফার গাছের পাতা, কিন্তু প্রত্যুত্তরে নীলাভ থাবার মতো ডাল নাড়িয়ে নিষ্ফল প্রতিবাদ বৈ আর কী করতে পারে?

ধুলার সোনালি বলয়ের মাঝ দিয়ে দলের পিছনে পিছনে পা চালায় তানিয়া, পাশেই ফিল্কা আর তার বাবা। দলের সর্বশেষ সদস্য হিসেবে বল্লাহরিণটিও আছে। এরও ভালো লাগছে না রাস্তার ধুলা আর মিনিট তিরিশেক পরপর বিউগলের দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে তোলা বাজনা। ক্যাম্পের সুরকাররা বিউগল হাতে নিয়ে বোঝাই মালগাড়ির পিছনে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যাচ্ছে। লাল ফৌজের সৈন্যরা ট্যাংকের বহরে চলছে আর বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। এত শব্দের ডামাডোলে বল্লাহরিণটি চমকে যায়, মুহূর্তেই শিকারীর হাত ফসকে ছুট দেয় বনের দিকে, আর হারিয়ে গেল উঁচু উঁচু পাইন গাছের বনে।

হরিণের পিঠে বাঁধা মালামাল, এর মধ্যে রাখা তানিয়া আর ফিল্কার মেডেল সবই হারিয়ে গেল। তাই হরিণের খোঁজে বেরুল সবাই।

বার্চের বনে খুঁজে পাওয়া গেল একে। ভীরু হরিণটার মতো বার্চের পাতাও যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। বেশ সময় নিয়ে তাড়িয়ে আনতে হলো। সড়কে উঠে দেখে বিউগলের সুর আর শোনা যাচ্ছে না, অ্যাসফল্টের ওপরে থিতিয়ে পড়েছে ধুলার আস্তরণ। পাতা নড়ে না ফার গাছের। ক্যাম্প চলে গেছে বহুদূরে।

তানিয়ার কাঁধে ব্যাগ আর পায়ে প্লিমসল জুতো। নুড়িপাথরের ঘষায় জুতোর তলা ছিঁড়ে গেছে। বাড়ি ফিরে এসে দেখে কেউ নেই। প্রতিদিন তার মা হাসপাতালে যাওয়ার আগে তার জন্য অপেক্ষা করেন। দেখা না হওয়ায় হাসপাতালে ডিউটিতে চলে গেছেন।আর নানি কাপড় কাচার কাজে চলে গেছেন নদী ঘাটে। কিন্তু বাগানের গেট হা করে খোলা। খোলা গেট দিয়ে তানিয়া বাগানে এসে দাঁড়ায়।

এক গেলাস ঠান্ডা জল আর দূর্বা ঘাসের মাঠে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকা, শ্রান্ত পথিকের পরিতৃপ্তির জন্য আর কী চাই! বেড়ার তলে শুকনো ঘাস হলুদ হয়ে আছে। হিমশীতল রাত্তিরে ঘাসের ডগা কুঁচকে যায়। সারা দিনমান শেষে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ঘাসফড়িংরা আসে, ঘাসেরাও যেন প্রাণ ফিরে পায়। ইট-পাথরের শহরে ঘাসফড়িংরা কেন আসে? এ রহস্যের উত্তর শহরবাসীরা আজও জানে না।

বাড়ির উঠোনে শীত-গ্রীষ্ম সারাবছর পড়ে থাকে পুরোনো স্লেজ গাড়ি। আর এর সাথে বাঁধা থাকে জলের পিপে। তাতে জল জমানো হয় বারো মাস। তানিয়া ছিপি খুলে জল দেয় শ্যাওলা ঢাকা লিলিফুল গাছের শিকড়ে, এরপর আঁজলা ভরে জল খায়। বাড়ির বারান্দা ঘেঁষা জায়গায় কিছু বাড়ন্ত গাছের দিকে এগোয় তানিয়া। প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আকাশ ছোঁয়ার পাল্লা দিচ্ছে বিশালাকার ফার গাছ আর পেলব ডালের সাদা বার্চ। উঠোনের অর্ধেকটা জুড়ে আছে ফার গাছের ছায়া। এখনো সবুজ শ্যামল পাতার ঝালরে ঢেকে আছে গাছটা। কিন্তু বার্চের পাতা হলুদ হতে শুরু করেছে। সাদা বার্চের কালো গিঁট ধরে তানিয়া ভাবে, ‘সত্যি কি শরৎকাল চলে এলো?’

তানিয়া হাত বাড়িয়ে ধরল বার্চের ঝরা পাতা। পাতাটি কুঁচকে গেছে।

'হ্যাঁ, তাই তো, ‘ মনে মনে বলল তানিয়া। ‘তবে আইরিশের ঝোপ তো এখনো সতেজ, হয়তো আমার লিলিফুল টিকবে কিছুদিন, কিন্তু সবাই গেল কোথায়?’ হঠাৎ পায়ের কাছে কিছু নড়েচড়ে ওঠে। চাপা গলায় গরগর আওয়াজ

তুলছে। তানিয়া নিচে তাকিয়ে তার বুড়ো মেনি বিড়াল ‘কসাক’কে দেখল ছানাপোনাদের নিয়ে হুটোপুটি করছে। সবই তানিয়ার মন পাওয়ারচেষ্টা।

এমন সময় হেলেদুলে চলে এলো একটা পাতিহাঁস। ঠোঁটে একটা কেঁচো ঝুলছে। বিড়ালছানারা, এমনকি ওদের সবচেয়েছোট সদস্য ‘ঈগল’ও ভয় পেল না হাঁস কিংবা লকলক করা কেঁচোকে দেখে।

গেটের সামনে একটা কুকুর চলে এলো। বেশ বয়স হয়ে গেছে, শীর্ণকায় শরীর, তার তুলনায় মাথা বেঢপ বড়। হঠাৎ তাকে দেখলে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো লাগে।

তানিয়ার সাথে চোখাচোখি হতেই সে থমকে দাঁড়ায়। তানিয়ার সাথে সবার শেষে দেখা হলো বলে তার সলজ্জ চোখ ছলছল করে। হঠাৎ উলটোদিকঘুরে হাঁটা শুরু করে দেয়, এমন ভান করে যে, তানিয়াকে দেখেনি। কুকুরের এক জীবনে কত কিছু যে ঘটে!

যতটা সম্ভব লেজ না নাড়িয়ে চুপচাপ পিপের কাছে পৌছায়। কিন্তু যেই তানিয়া তাকে ডাকল, তার সমস্ত অভিনয়ের পালা শেষ হলো।

‘টাইগার,’ তানিয়া গলা চড়িয়ে ডাকল।

সাথে সাথেই কুকুরটি বেঁটে বেঁটে পায়ে ছুটে আসল তানিয়ার কাছে। কাছে এসে তানিয়ার হাঁটুতে গা ঘষতে লাগল। তানিয়া দীর্ঘক্ষণ বসে আদর করে হাত বুলাতে লাগল তার মাথায়। মাথার শুষ্ক চামড়ায় লোমগুলো লেপটে আছে।

‘কসাক’, ‘টাইগার’ নামগুলো ফৌজি ধারার হলেও এরা আদতে সব রোগাটে আর বুড়ো। মমতা মাখা চোখে টাইগারকে দেখছিল তানিয়া, কিন্তু কখন যে তার নানি চলে এসেছেন টের পায়নি সে। যখন সে চোখ তুলে তাকায়, নানিকে কাছেই দাঁড়ানো দেখল। মুখে তার বলিরেখা, ম্রিয়মাণ দুচোখে বয়স ভর করেছে। বালতিভর্তি ধোয়া কাপড়চোপড় মেঝেয় রেখে চুমু খেলেন তানিয়াকে।

‘তুই আর ফিল্কা, যেন হরিহর আত্মা,’ হেসে হেসে বললেন নানি। ‘সই, তুই আর আমি আছি গো, তোর মা কখন যে বেরিয়ে গেছে। তুই এলি দেরি করে, তাই। কিছু খাবি? কী খেয়েছিস না খেয়েছিস ক্যাম্পে, কে জানে! আমি নিশ্চিত, তোর মন টেকেনি ওখানে।’

কিন্তু তানিয়ার খিদে নেই। ব্যাগটা নিয়ে সে ভেতরের ঘরে ঢুকল।

নিরালা ঘর। বইয়ের তাকে বইগুলোর ওপরে আঙুল টেনে টেনে চলল।

হ্যাঁ, নানিজান ঠিকই বলেন। অধিকাংশ সময়ই তার একাকিত্বে কাটে। শুধু সেই জানে এই বাড়াবাড়ি রকমের স্বাধীনতা কতটা ক্লান্তিকর লাগে! তার না আছে ভাইবোন, না মাকে সবসময় কাছে পায়। আগে তানিয়ার মা যখনই বাইরে যেতেন, তানিয়া কেঁদেকেটে গাল ফুলাত। এখন সয়ে গেছে। সে নানিকে একবারও জিজ্ঞেস করেনি মা কখন ফিরবেন। শুধু আলমারি থেকে তার মায়ের পোশাক বের করে ধরে ধরে দেখল, মায়ের বিছানায় চুপ করে বসে থেকে আবার উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল ফুলবাগানে। তার মনে পড়ল বন থেকে আনা লিলিফুল গাছটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।



‘শরৎকাল এখন।’নানির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। ‘ফুল তো টিকবে না।’

‘তুমি একে শরৎকাল বলো, নানিজান, দেখো না, তাকিয়ে দেখো একবার।’তানিয়ার কল্পনাবিলাসী চোখ সুদূর পানে চায়।

শহরে এখনো কুয়াশা নেই। দূর পাহাড়ের চারপাশ সবুজ আর সবুজ। মনে হয় এই তো বসন্ত। গরম দিনের মতো সূর্যাস্তের বেলা এখনো কমেনি। বাগানে সুবাসহীন বড়বড় ফুলের সমারোহ।

মনে হচ্ছে আরও কিছুদিন মার্শলিলি ফুটবে। কিন্তু তার আগে তো চাই শিকড়ের আশ্রয়। তানিয়া বড় ছুরি দিয়ে ফুলের বেডে কতগুলো গর্ত খুঁড়ে লিলিফুল গাছের মূল পুঁতে ফেলল মাটিতে আর একটা মোটা ডালের সাথে বেঁধে দিলো লিলিগাছকে।

টাইগার বেডের চারপাশে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ ওর প্রকাণ্ড মাথা তুলে বেড়ার দিকে তাকাল। তানিয়াও তাকাল সেদিকে।

ফিল্কা বসে আছে বেড়ার ওপরে। জুতো আর জ্যাকেট খুলে গেঞ্জি পরে বসে আছে। তাকে বেশ উল্লসিত লাগছিল।

‘তানিয়া, আমাদের বাসায় এসে দেখে যাও, বাবা আমাকে কী উপহার দিয়েছেন! এক পাল কুকুর! ভাবতে পারো তুমি?’ ফিল্কা চেঁচিয়ে বলল।

কিন্তু তানিয়া চোখ না তুলে মাটি খুঁড়ে চলল। ঘামে তার মুখ চকমক করছে। তার দুই হাত কাদামাটিতে মাখা।

‘মিথ্যুক!’ ক্ষোভ জড়ানো কণ্ঠে বলে উঠল তানিয়া। ‘আমাকে বোকা ভেবো না, কই, আমরা তো একসাথেই ফিরলাম, কখন আনলেন?’

‘সত্যি বলছি, কসম!’ ফিল্কা মরিয়া হয়ে বলল। ‘আমাকে দেওয়ার জন্য তিনদিন আগেই আমাদের বাড়িওয়ালির কাছে রেখেছিলেন। আমাকে চমকে দিতে চেয়েছিলেন। বাবা তোমাকে আসতে বলেছেন দেখানোর জন্য। আসবে? এসো।’

তানিয়া আবার চোখ তুলে ফিল্কাকে দেখল। নাহ, ফিল্কা মিথ্যা বলতে পারে না।

লোকে যা স্বপ্নে দেখে, তা প্রায়ই পেয়ে যায়।বাবারাই স্বপ্ন পূরণ করেন। তানিয়া এ সবই বইয়ে পড়েছে।

সে ছুরি ফেলে নেমে এলো রাস্তায়। পাশেই ফিল্কার বাড়ি। মিনিটখানেক লাগে যেতে। বাড়ির গেট আগেই ফিল্কা খুলে রেখেছিল।

গেট পার হয়ে তানিয়া বাড়ির চত্বরে আসে। সামনেই এক পাল কুকুর। আর ফিল্কার বাবা পাশে বসে গুড়গুড় আওয়াজ তুলে পাইপ টানছেন। বেড়ার সাথে বল্লাহরিণ আর কুকুরগুলো বাঁধা। হাস্কিদের মতো এই কুকুরদের লেজও ছাটাই করা। সব গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে আছে। মাথা না তুলে হিংস্র চোখে তাকায় তানিয়ার দিকে। শিকারী লাফ দিয়ে উঠে তানিয়াকে আড়াল করে দাঁড়ালেন।

‘ভয় পেয়ো না দোস্তো। এরা বোবা প্রাণী। একদম নিরীহ।’আশ্বস্ত করলেন ফিল্কার বাবা।

‘তোমার ডিঙ্গোর থেকেও নিরীহ,’ ফোড়ন কাটল ফিল্কা।

‘আমি জানি হাস্কিরা কেমন,’ তানিয়া ধীরে ধীরে বলল। ‘কিন্তু এরা কোনোদিক দিয়েই ডিঙ্গোর মতো নয়। এদের স্লেজগাড়ির সাথে জুড়ে দিন না।’

শিকারী ভ্যাবাচাকা খেলেন। এত তপ্ত রোদের দিনে এসব করলে বোকামি হবে। কিন্তু ফিল্কাও তানিয়ার মতো আবদার শুরু করল। অগত্যা কী আর করা! মেনে নিলেন ওদের আবদার। ছাউনি থেকে স্লেজগাড়ি বের করে কুকুরদের ডাকলেন। ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে উঠে পড়ল সব কুকুর।

স্লেজগাড়ির জৌলুশে তানিয়ার চোখ সরে না। কুকুরদের মাথায় পরা সাদা পালকের সাজ যেন হাওয়ায় দোলা শণের বন।

‘বাহ! দারুণ উপহার তো!’

তানিয়ার চোখেমুখে খুশির ঝিলিক। অল্পবয়সি মেয়ের করা প্রশংসায়ও শিকারী আপ্লুত হলেন। কারণ তিনি সবার কথার দাম দিতে জানেন। সবাই এটা জানুক যে তিনি কতটা হৃদয়বান।

সবাই স্লেজগাড়িতে উঠে বসল। তানিয়া হাতে নিল কাইউর।

(টীকা : কাইউর–অ্যাশ কাঠের ছড়ি যার শেষ প্রান্ত লোহায় মোড়ানো থাকে)

শুকনো খটখটে জমিনে কুকুরগুলো বৃথাই স্লেজ টানার চেষ্টা করল।

শিকারী থলে থেকে কিছু ইউকোলা (টীকা : ইউকোলা–স্যামন মাছের শুঁটকি) ওদের দিকে ছুড়ে দিলেন পুরস্কার হিসেবে। এরপর তানিয়া আর ফিল্কাকে স্মেল্ট মাছের শুঁটকি খেতে দিলেন। ফিল্কা সশব্দে চিবিয়ে খাচ্ছিল, যদিও তানিয়ার খুব একটা ভক্তি হচ্ছিল না খেতে। কিন্তু ফিল্কার দেখাদেখিও খেতে শুরু করল সে।

শিকারী বনযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তার আর শহরে থাকা চলে না। সারাদিনই হয়তো বল্গাহরিণে চেপে ছুটতে হবে। কুকুরগুলো স্লেজগাড়ি থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছাউনিতে ঢোকালেন, আর বল্গাহরিণকে বেড়া থেকে খুলে নিয়ে কিছু নুন খেতে দিলেন। আজ অনেকটা পথ যেতে হবে। তানিয়া আর ফিল্কা তাকে এগিয়ে দিয়ে এলো কিছুদূর। শিকারী যাওয়ার আগে তানিয়ার হাতে হাত রেখে এ বছরের প্রথম তুষারপাতের পরে তার খোঁজ খবর নিতে আর্জি রাখেন।

‘জীবনে একজন ভালো শিকারী হও, বাবা। এবং একজন ভালো ছাত্র।’ফিল্কাকে কাছে ডেকে বললেন তিনি।

কস্তিয়ার কথা মনে পড়ায় যোগ করলেন, ‘তোমাকে যেভাবে রুমাল বাঁধতে বলা হয়েছে, সেভাবেই বেঁধো, বাবা।’

লাগাম ধরে হরিণটির পিঠে চেপে বসলেন তিনি। রাস্তার বাঁকে পৌঁছে শেষবারের মতো তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে।

শিকারীর শ্যামলা মুখ দেখে মনে হয় এ যেন কারুশিল্প। দূর থেকেও বড্ড আপন লাগে এই মুখ। বিদায় দিতে কষ্ট হয় তানিয়ার।

‘তুমি বড় ভাগ্যবান, ফিল্কা। এমন একজন বাবা পেয়েছ।’

‘আমাকে যখন মারেন না, তখন তাকে ভালোবাসি,’ দাঁত বার করে হেসে হেসেবলল ফিল্কা।

‘সত্যিই মারেন!’ তানিয়ার চোখে অবিশ্বাস।

‘উঁহু, কেবল যখনই মাতাল হন।’

‘হায় ঈশ্বর!কী বলো?’

‘কেন? তোমার বাবা বুঝি তোমায় মারেন না! আচ্ছা, তিনি কোথায়?তাকে তো দেখি না।’

তানিয়া অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকাল ফিল্কার দিকে। বোঝার চেষ্টা করল ফিল্কার চোখে নিছক কৌতূহল না কি উপহাস লুকিয়ে আছে। তার মনে পড়ছে না কখনো ফিল্কাকে তার বাবা সম্পর্কে কিছু বলেছে কিনা।

ফিল্কার চোখের দিকে তাকাল। নাহ!এ চোখে কোনো ছলনা থাকতে পারে না। অকপট সে দৃষ্টি।

'না, উনি আমায় মারেননি কখনো।'

'তবে তো তুমি তাকে ভালোবাসো।'

'না, বাসি না।'

'মানে? কেন ভালোবাসো না?' একটু চুপ থেকে ফিল্কা বলল।

তানিয়া ভ্রুকুঁচকাল। তাতেই ফিল্কা চুপ হয়ে গেল। যেন সে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলল।

তানিয়ার মনে হলো ফিল্কা আর প্রশ্ন করার সাহস পাচ্ছে না।

তানিয়া সহসাই আরক্ত হয়ে উঠল।

'আমি সত্যি জানি না গো উনি কোথায়।'

'মরে গেছেন।'

সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

'তাহলে তিনি কোথায়?'

'দূরে, অনেকদূরে, সাগরের ঐ পাড়ে।'

'আমেরিকায়?'

মাথা ঝাঁকায় তানিয়া।

'আমেরিকায়! আমি জানতাম।'

তানিয়া আবার ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ে।

'তাহলে কোথায়?' ফিল্কার মুখ হা হয়ে গেছে। তানিয়া তাকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে।

'তুমি কি জানো আলজেরিয়া আর তিউনিসিয়া কোথায়?' তানিয়া জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, জানি তো, ও দুটো আফ্রিকার দেশ। তিনি কি আফ্রিকায় থাকেন?'

কিন্তু তানিয়া আবার তাকে হতাশ করল।

'না, ফিল্কা, তুমি কি মারোসিকা কোথায় আছে, জানো?'

'মারোসিকা?' বিড়বিড় করল ফিল্কা। সে জানত না মস্কোর এক সড়কের নাম মারোসিকা। কিন্তু নামটা শুনে তার পছন্দসই হলো।

'মারোসিকা, এটা অবশ্যই কোনো রূপময় কোনো দেশ,' ফিল্কা ভাবল।

'হ্যাঁ, সত্যিই তাই। সেখানেই তিনি থাকেন,' বলেই তানিয়া এক দৌড়ে সড়ক ছেড়ে তার বাগানে চলে এলো।

ফিল্কা বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাঝরাস্তায়।

‘মারোসিকা,’ সে আবার আওড়াল। মনে করার চেষ্টা করল। এটা কি কোনো দ্বীপের নাম? হয়তো এবারের ক্যাম্পে যেয়ে মনভুলো রোগে পেল! দ্বীপের নাম তার খুব একটা মনে থাকে না। গড়পড়তা ছাত্র সে, একজন শিকারীর পুত্র। যার জন্ম গহীন বনের তাঁবুতে, বন-ই যার পৃথিবী, দ্বীপের নাম মুখস্থ করে কী লাভ হবে তার!

****

তিন

পিপে থেকে কলসিতে কলকল শব্দে জল পড়ে, এ যেন ছাতা পড়া কোনো পিপে থেকে জমানো জল নয়, মনে হয় এক ক্ষুদে ঝরনা নুড়ি পাথর ছাড়িয়ে নিজের পথ করে নিয়ে গড়িয়ে পড়ছে উঁচু পাহাড় থেকে।

জল গড়ায় সুমধুর তানে। কৃতজ্ঞতার ছোঁয়া বাজে সুরে। এ সুরের নৈবেদ্য তার প্রতি যে পিপের কাঠের ছিপিতে হাত রেখে জলকে বাধাহীন গতির স্বাধীনতা দিলো। সুললিত ধারায় বয়ে চলা জল যেন তানিয়ার মনোযোগ কেড়ে নিতে চায়।

কিন্তু তানিয়া না কিছু দেখল, না কিছু শুনল। কাঠের ছিপি ধরে ভেবে চলেছে তার বাবার কথা। ফিল্কার সাথে আলাপের পরে তিক্ত স্মৃতি বারেবারে ফিরে আসে। ব্যথাতুর করে তোলে মন।

মস্কোর মারোসিকা সড়কে বাস করা লোকটি তার বাবা, এটা সে ভাবতে পারে না; কীভাবে সে ভাবতে পারে? যাকে কখনো সে দেখেনি, আর যাই হোক, তাকে আন্দাজ করা যায় না, তাকে নিয়ে গল্প করা চলে না। বেদনা তাকে ভাবতে শিখিয়েছে, নিজেকে বুঝতে শিখিয়েছে। কালে কালে সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে, সে তার বাবাকে ভালোবাসেনি, ভালোবাসতে পারে না, ভালোবাসা উচিতও না।

তানিয়া যখন খুব ছোট,তার বাবা অন্য নারীর প্রেমে পড়েন। তার মাকে ছেড়ে, তাকে ছেড়ে অন্যত্র সংসার পাতেন। হয়তো-বা এখন কমপক্ষে এক বা একাধিক সন্তান রয়েছে তার।

তার কাছে ‘বাবা’ বলে কিছু নেই। তার মা এই সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে তানিয়াকে কখনো জোড়াজুড়ি করেননি।

তারও তো আত্মসম্মান বোধ আছে। যখনই এ বিষয়ে কথা ওঠে, তার বুকে ব্যথা করে ওঠে।

চিন্তারা পাখা মেলে। কাছেই যে কখন কলসির কানা পূর্ণ হয়ে উপচেপড়া জল গড়িয়ে তার পা স্পর্শ করে, তানিয়া টের পায় না। নুড়ি পাথর পাশ কাটিয়ে জলের ধারা বয় ফুলের বেডের দিকে, রয়ে যায় গোলকধাঁধার মতো জলে আঁকা পথ। তানিয়ার দিবাস্বপ্ন ভেঙে যায় নানির চিৎকারে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

'হায়! হায়! কি করলি? পিপের জল তো সব শেষ হয়ে গেল,আর নিজেও তো জলে ভিজে একাকার। বোকা রে! তোর মাকে জল বাবদ কত টাকা যে খরচা করতে হয়!'

তানিয়া মাথা নিচু করে নিজেকে দেখল। তার দুই হাত কাদামাখা, পায়ে ছেঁড়া প্লিমসল জুতো, আর মোজা জোড়াও ভিজে চুপচুপে।

সে তার ভেজা পা তুলে দেখাল নানিকে। দেখে চুপ করে গেলেন তিনি। তাড়াহুড়ো করে কূপ থেকে টলটলে পরিষ্কার জল নিয়ে এলেন। শীতল জল দিয়ে ধীরে ধীরে তানিয়া তার গায়ে লেগে থাকা ধুলাবালি, কাদা ধুয়ে ফেলল।

'অস্বীকার করার উপায় নেই, তুই গায়ে গতরে বেড়েছিস। সামনেই তোর বয়স পনেরো ছোঁবে। কিন্তু তোর মধ্যে গাম্ভীর্য আসেনি, ভাবুকই রয়ে গেলি।'

'তার মানে কী নানিজান?' মাথা কাত করে জিজ্ঞেস করল তানিয়া। 'আমি কি বুদ্ধিমতী?' চোখে তার সরলতা খেলা করে।

'বুদ্ধিমতী না ছাই! বোকার হদ্দ একদম।জানিস কেন? কারণ তুই ভাবিস বেশি। এখন ওসব কথা রাখ, শুকনো মোজা পরে নে।'

নানির শাসনের সুর পছন্দ করে তানিয়া। দুবলা শরীর নানির, কিন্তু এই গাঁট-ফোলা শক্ত হাতেই তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন।

শান্ত-সুবোধ বালিকার মতো চটপট জুতো মোজা দরজার সামনে খুলে রেখে ঘরে ঢুকল সে। মেঝেতে বিছানো হরিণের চামড়ার পাটিতে পা ঘষে বিছানায় উঠে পড়ল। বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে হাত গরম করার জন্য বালিশের নিচে দুই হাত ঘষতেই কূপে জমা জলের চেয়েও ঠান্ডা কিছু খসখস করে ওঠে।বালিশের নিচ থেকে টেনে বের করল জিনিসটাকে। ভাঁজ করা মলিন একটা চিঠি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বহুবার পড়া হয়েছে এটা।

'কোত্থেকে এলো এটা? মাকে তো কখনো বালিশের নিচে চিঠি রাখতে দেখিনি,' ভাবল তানিয়া।

পাশেই একটা খাম। বুকটা ধক করে উঠল। প্রেরকের ঠিকানা না পড়লেও তানিয়া চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারে এই চিঠি দিয়েছেন তার বাবা।

তিনি সম্ভবত ভয় পাচ্ছিলেন চিঠিটা ঠিকঠাক মতো পৌঁছাবে কিনা, তাই গোটা গোটা অক্ষরে বড় করে লিখেছেন তার ঠিকানা :

বাড়ি নম্বর ৫৩

৪০, মারোসিকা সড়ক

মস্কো।

চিঠিটা বিছানায় রেখে খালি পায়ে তানিয়া সারা ঘরে হেঁটে বেড়ালো আরও একবার। এরপর চিঠিটাকে বার করে পড়তে শুরু করল।

‘প্রিয় মাশা,

তোমাকে কয়েকবার চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, চিঠিগুলো হয়তো তোমার কাছে পৌঁছায়নি। তোমরা এতদূরে থাকো, মনে হয় পৃথিবীর অন্য প্রান্তে আছো। কতদিন দেখিনি তোমাদের! আমার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে অবশেষে। পুবে কাজ পেয়েছি,তোমার শহরেই আমি আসছি। নাদিয়া, কলিয়াও আসছে। কলিয়া তানিয়ার স্কুলে ভর্তি হবে। ইতোমধ্যে সে স্কুলে মনোনীত হয়েছে। তুমি তো জানো, ও কত প্রিয় নাদিয়া আর আমার কাছে। ভ্লাদিভস্তক থেকে আমরা বোটে উঠেছি। আশা করছি, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে চলে আসব। প্লিজ, আমার কথা সবকিছু বলো তানিয়াকে। আমি ভালো বাবা হতে পারিনি, এ লজ্জা আমার। এটা এজন্য না যে, আমরা আলাদা হয়ে গেছি। এটাই হয়তো আমাদের ভবিতব্য। আমি শুধু নিজেকে দায়ী করতে পারি না। কিন্তু এ-ও আমি জানি তানিয়া আমার কাছে কত দামি, আর তাকে শুধু বঞ্চনাই সইতে হয়েছে।আমি তাকে লিখিনি বললেই চলে। তানিয়াও আমাকে চিঠি দেয় না, সেই কবে যখন ও লিখতে-পড়তে শুরু করেছে, তিন-চার শব্দের বেশি লিখতে পারত না। সেই সময়ে কয়েকটা চিঠি লিখেছিল। আমি বুঝতে পারি ও আমায় পছন্দ করে না। আমায় তো দেখেনি, তাই। ওর সামনে দাঁড়াতে আমার ভয় হচ্ছে। আমরা যখন আলাদা হই, ও তখন আট মাসের শিশু। কি ছোটছোট দুটি পা, পায়ের আঙুলগুলো মটরশুঁটির দানার মতোই ছোট। গোলাপিরঙা ছোট দুটি হাত, এখনো সবকিছু মনে আছে আমার..’

এবং তানিয়ার কিছুই মনে নেই। সে তার দুই পায়ের দিকে তাকায়, বাদামিরঙা তন্বী দুই পা। পা যেন তার পাখা আর পায়ে ভর দিয়েসে উড়ে উড়ে চলে। তার দুই হাতের দিকে তাকায়, কবজি দুটো সরু, কিন্তু আঙুলগুলো সুদৃঢ় কঠিন। তার মা ছাড়া কেউই সপ্রশংস দৃষ্টিতে এসব খেয়াল করে না, যেমন একজন চাষি যতটা খুশি হয় যখন দেখে তার খেতেলাগানো মটরশুঁটি বীজ থেকে চারা গজায়।

তানিয়া কাঁদে, ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে। কিন্তু কান্নার পরে শান্তি নেমে আসে যেন এক পশলা বৃষ্টির পরে চরাচর জুড়ে স্নিগ্ধতা বয়ে যায়।

আনন্দ ধরে না তার মনে, এ কি ব্যাধের তৃপ্তি শরবিদ্ধ হরিণ দেখে, না কি তেষ্টা পাওয়া পথিকের স্ফূর্তি এক গেলাস ঠান্ডা জলে?

কারণ যে তার বাবা আসছে!

বিছানায় লাফ দিয়ে উঠে সারা ঘরে বালিশ ছড়ায়, চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়, হাসি আর কান্না মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তার, যতক্ষণ-না মনে পড়ে সে ভালোবাসে না তার বাবাকে। কই আজ তার আত্মগরিমা? পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে কলিয়া নামের ছেলেটি, তাই নয় কি?

‘আমি ওদের ঘৃণা করি, ঘৃণা করি সবসময়,’ ফিসফিস করে বলে ওঠে তানিয়া। হৃদয় জুড়ে বেদনার ঝড় বয়ে যায়। তানিয়া বিছানা থেকে নেমে হাত মুঠো করে সজোরে ধাক্কা দেয় জানালার শার্সিতে।

খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় তানিয়া। সে আজ তৃতীয়বারের মতো ফিল্কাকে দেখে। শঙ্কাহীন কিন্তু বিধ্বস্ত তার মুখ। সে বেদনা ছোঁয়াচে হয়ে স্পর্শ করে তানিয়ার মন।

ঊরুতে মানচিত্র বিছিয়ে জানালার কাছে ঢিবিতে বসল ফিল্কা।

'মারোসিকা নামে কোনো দেশ নেই,' তার কণ্ঠে দুঃখ ঝরে। 'মরোক্কো নামে এক দেশ আছে, আর একটা দ্বীপের নাম ম্যালোর্কা। কিন্তু মারোসিকা–কোথাও নেই, কোথাও। না দ্বীপ, না মহাদেশ। তুমি আমায় এমন করে বোকা বানালে কেন?'

তানিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাকায়।

'শান্ত হও, ফিল্কা। এরকম কথা বলার সাহস করো না,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'এটা ভাববার মতো কোনো বিষয় নয়।'

'আমি কি কোনোভাবে তোমায় কষ্ট দিয়েছি?' ফিল্কা জিজ্ঞেস করল। তানিয়ার চোখে অশ্রু টলমল করে দেখে ফিল্কার হাত যেন বিবশ হয়ে ঝুলে পড়ল। তার শূন্য লাগে সবকিছু।

ক্ষণিকেই মিথ্যাকে সত্যের মতো করে বলতে ওস্তাদ ফিল্কা।

মানচিত্রে চাটি মেরে বলল, 'আলবাত মারোসিকা নামে দেশ আছে। আমি জানি তো। এই পুরোনো মানচিত্রটা কোনো কাজের নয়। সবকিছু নেই এতে। আমার পষ্টমনে আছে, স্কুলে মারোসিকা পড়ানো হয়েছে।'

হঠাৎ মনে হলো ফিল্কাকে নতুন করে দেখছে তানিয়া। এই মিথ্যেটুকু তার মনে শান্তি এনে দিলো।

'সত্যিকারের বন্ধুও তাহলে আছে,' মনে মনে বলল তানিয়া। 'আমি ওকে বদলে যেতে দেব না। ওর সবকিছু নিয়ে এমনকি তুচ্ছ জিনিস নিয়েও আমার সাথে গল্প করে।'

'আমি তোমায় কিছু বলিনি, ফিল্কা। অন্য একটা ছেলে আছে, কলিয়া নাম তার। তার সম্পর্কে বলছিলাম। আমার খারাপ লাগছে। মাপ করো আমায়।'

তার ক্ষমা চাওয়ার দরকার ছিল না। ফিল্কা তার কণ্ঠে বেদনার ছোঁয়া দেখেই ক্ষমা করে দিয়েছিল।

'ওহ, সে যদি বাইরের লোক হয়, তাহলে ভাববার কিছু নেই। আমিও ওসব নিয়ে ভাবছি না। কিন্তু আমায় এটা বলো, তুমি ওকে ঘৃণা করো কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে পালটা প্রশ্ন করল তানিয়া।

'তুমি কি জানো না ফিল্কা, সবারই একটা সম্মানের জায়গা থাকে।'

'অবশ্যই তানিয়া, যদি না কলিয়াবিষয়ক কোনো কথা থাকে,' ফিল্কা সাফ জানিয়ে দেয়। 'ল্যাসো আর লাঠি দুটোই সমান চালাতে পারি। এরকম কাউকে দরকার হলে আমায় ডেকো। তাইগায় শিকারের সময় শিখেছি সব।'

'কিন্তু তুমি তো তাকে চেনো না। কেন তাকে মারতে যাবে?'

'আমি তো তোমায় চিনি। এই যথেষ্ট,' ফিল্কার মুখে প্রশান্তির হাসি।

আঘাতের বদলা আঘাতেই, কাঁদে তো বোকারাই। কিন্তু জগতের এ চিরাচরিত নিয়ম তার হৃদয়কে কুরে কুরে খায়। একসময় সে তিতিরপাখি শিকার করত লাঠি বা পাথরের আঘাতে। কিন্তু তার মন বদলে গেছে।

'আমি নীচ, হিংসুক হয়ে যাচ্ছি,' নিজেকে শাসালো তানিয়া।

ফিল্কা তানিয়ার ঘাড়ের পিছনে কাউকে দেখে তড়িঘড়ি করে মানচিত্র বগলে নিয়ে বাগান ছেড়ে বের হয়ে গেল।

অ্যাপ্রোনের উপরে ম্যাকিনটোশ গায়ে তানিয়ার মা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন।

হঠাৎ তানিয়া বুঝে উঠতে না পেরে হা করে তাকিয়ে রইল তার মায়ের দিকে। রোজকার দিনের থেকে আজ আলাদা লাগছে তার মাকে। চেনা রূপকে আজ লাগছে অচেনা। তার পায়ের জুতো অস্বাভাবিক রকমের বড়। কখনো নিজের প্রতি খেয়াল রাখেন না। তার এই হাত দুটো দিয়ে এই সংসারকে আগলে রেখেছেন একাকী।

কিন্তু তার মায়ের দৃষ্টি একইরকম মায়াময়। চিরকাল যেমন দেখে এসেছে তানিয়া। ধূসর চোখে তাকালেন তানিয়ার দিকে।

তানিয়ার সমস্ত ব্যথা-বেদনা যেন ডুব দেয় তার চোখের গভীরে। হারিয়ে যায় অতলে। যেমনিভাবে এক মুঠো নুন মিলিয়ে যায় অথৈ সাগরজলে।

সে আলতো করে চুমু খায় মায়ের গালে। খুব সাবধানে, যাতে মায়ের চোখ ঢেকে আঁধার না নামে।

'মা,' ডাকল সে।

মা তাকে জড়িয়ে ধরল।

'আমি চলে এসেছি তাড়াতাড়ি, তোমায় খুব মনে পড়ছিল সোনামণি।'

বেশ খানিকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তানিয়াকে। তার সজাগ দৃষ্টি খুঁজে ফেরে ফ্যাকাশে হওয়া কন্যার চুলে, তামাটে রঙের রোদপোড়া মুখে।

'ক্যাম্পে ওর ভালো উন্নতি হয়েছে,' ভাবলেন তার মা।

এরপর পায়ের দিকে তাকিয়ে খেয়াল করলেন তানিয়ার পায়ে জুতো নেই। এলোমেলো ঘরখানা নজরে এলো তখন, বালিশগুলো সারা ঘরে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে। টান টান নেই বিছানার চাদরটা। আর চিঠিটা চাদরের ওপরেই পড়ে আছে।

তানিয়া যে ভয় পাচ্ছিল সেটাই সত্যি হলো। যেন দমকা বাতাসে মায়ের চোখজোড়া নিষ্প্রভ হয়ে এলো। তার চোখে শঙ্কা, উদ্বেগ আর সতর্ক চাউনি। হয়তো তিনি কিছু লুকোতে চাচ্ছেন। নইলে কতটা সময় কেটে গেল এলোমেলো ঘর দেখে কিছুই বলেননি তিনি।

'তানিয়া, চিঠিটা পড়েছিলে?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

তানিয়া নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

'তোমার খুশি হওয়া উচিত, তানিয়া।'

তানিয়ার মুখে কথা সরে না।

তার মা অপেক্ষার ক্ষণ গুনতে লাগলেন।

'মা, ছেলেটা কি আমার ভাই?' তানিয়া জিজ্ঞেস করল।

'না,' মাথা নাড়লেন তার মা। 'সে নাদিয়েজদা পেত্রোভনা ওরফে নাদিয়ার ভাগ্নে। কিন্তু ওরাই ছেলেটাকে বড় করেছে। তোমার বাবা ভীষণ ভালোবাসেন ওকে। ছেলেটা অনাথ। তোমার বাবার মতো হৃদয়বান মানুষ আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। আমি তো তোমাকে একথাই বলতে চেয়েছি সবসময়।'

'তাহলে সে তো আমার ভাই নয়,' মাথা নিচু করে বলল তানিয়া।

তার মা আলতো করে তানিয়ার থুতনি তুলে ধরে ওর গালে চুমু খান।

‘তানিয়া, মা আমার, এ নিয়ে পরে কথা হবে। জাহাজঘাটায় দেখা করো তাদের সাথে। তুমি নিজেই সব বুঝবে। তোমায় দেখে তোমার বাবা যে কত খুশি হবেন। যাবে তো মা?’

‘তুমি যাবে না মা?’

তার মা দৃষ্টি ঘোরালো অন্যদিকে।

‘না, তানিয়া, আমি পারব না। তুমি তো জানো, আমার কত ব্যস্ততা।’

পাশ ফিরে ঘুরতেই তানিয়া জড়িয়ে ধরল তাকে।

‘মা, শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি, চিরকাল তোমার পাশেই থাকব, আমার আর কারও প্রয়োজন নেই। আমি তাদের সাথে দেখাও করতে যাব না।’

****

চার

আজ সকালে তানিয়ার বাবার আসার কথা।

অবাক হওয়ার বিষয় হলো, লিলি ফুলগুলো এখনো সতেজ। এর কারণ কি পিপে থেকে গড়ানো ক্ষিপ্র জলের ধারা তৃষ্ণার্ত ফুল গাছগুলোর পিপাসা মিটিয়েছে, না-কি এরা এই উত্তর দেশের সুবাসহীন ফুলের মতো কষ্টসহিষ্ণু? এর উত্তর জানে না তানিয়া। কিন্তু যখনই সে ফুলগুলোর দিকে তাকায়, দেখতে পায় লম্বা বৃন্তে ফোটা লিলিফুলগুলো দোল খায়।

সে ফুলগুলো অন্য কাউকে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ফুলের বেডে হেলেদুলে বেড়ানো পাতিহাঁসটা বাসা বানানোর পায়তারা করতেই তাড়াল এটাকে। দূরে তাকাতেই তার চোখ পড়ল এই উত্তরের শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত কাঠের বুরুজের দিকে, ভোরবেলায় পাখির কূজনে মুখরিত হয় বুরুজের ফুলের কেয়ারি।

বুরুজে কোনো নিশান উড়ছে না, এর মানে হলো জাহাজঘাটায় কোনো জাহাজ ভেড়েনি। দেরি হচ্ছে কেন?

ধুর! কী এসে যায়! নিশান উড়লেই কী, আর জাহাজ ভিড়লেই-বা কী! তার মোটেই জাহাজঘাটায় যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। ইশ! আজ যদি চুলে ফিতে বাঁধে আর তার সবচেয়ে প্রিয় ফ্রকটা পরে!

আজ এবছরের স্কুলের প্রথম দিন। উৎসবের আনন্দ সবার মাঝে খেলা করছে। কিন্তু স্কুল শুরু হতে এখনো ঢের সময় বাকি। আজ এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল কেন তাহলে?

'ঘুম আসছে না, মা। ঘুম না আসলে কীই-বা করতে পারি?' বাইরে বের হওয়ার সময় দরজা ঠেলার ক্যাচক্যাচ শব্দে যদি মায়ের ঘুম ভেঙে যায়, তখন এই বলবে, সে ঠিক করে ফেলল।

বোটটি কি আদৌ আসবে? নাকি এ সবই অলীক ভাবনা, হয়তো-বা এই খেয়াতরি পাড়ি দিচ্ছে অন্য জগতের কুয়াশা জড়ানো গাং।

বাগানও কুয়াশাচ্ছন্ন। বার্চের ডালে শিশির জমে চকমক করছে; গাছগুলোর আলসে শরীরে যেন ঘুম ভাঙতেই চায় না। ভোর হবে হবে করছে, ইতোমধ্যে সড়কে শোনা যাচ্ছে কিছু পায়ের আওয়াজ। সবুজ ঘাসের মাঠ পেরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে কেউ একজন হেঁটে যাচ্ছে।হয়তো কোনো ভাই তার অপেক্ষারত বোনের জন্য জাহাজঘাটায় ত্রস্ত পায়ে ছুটছে, হতে পারে কোনো বাবা তার পুত্রকে আলিঙ্গন করার জন্য অধীর হয়ে আছেন, কিংবা কোনো জেলে তার তল্লাটের দোস্তদের খবর জানার জন্য। হয়তো-বা ফিল্কা, স্কুল শুরু হওয়ার আগে বরশির ছিপে নিজের ভাগ্যটাকে বাজিয়ে নিতে।

তানিয়া গেটের পাশে উৎকর্ণ হয়ে বসল। শিশিরভেজা লাজুক ঘাস আর মাথার ওপরে ঝুঁকে পড়া ডাল যেন এখনো ঘুমে ঢলঢল।

কিছুক্ষণ পরপর ভোঁ ভোঁ শব্দে ভেঁপু বাজতে শুরু করল, এত ক্ষীণ সুরে যে একমাত্র অপেক্ষায় থাকা কেউ এটা আঁচ করতে পারবে। কান খাড়া করে শুনলে মনে হয় বোটটি খুব সম্ভবত চর্নি অন্তরীপ লাগোয়া বুরুজের কাছাকাছি আছে। তানিয়া গেট খুলে সড়কে নেমে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই ফিরে আসল বাগানে। বাগানে ফুটে আছে কত ফুল! অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।ফুলগুলো এখনো তাজা, বাবা নিশ্চয়ই খুশি হবেন। যাই হোক, দেওয়ার মতো এই আছে তার। সে ঝুঁকে কিছু মার্শলিলি আর আইরিশ ফুল তুলল। কত যত্নে আগলে রেখেছিল!

তানিয়া টাইগারকে ইশারা করতেই তার পিছুপিছু চলল।

শহর এখনো আধোঘুমে আধোজাগরণে, জেগে আছে কেবল বুরুজটি। ঘুলঘুলির মতো ছোটছোট দরজার মাঝ দিয়ে অবারিত বাতাস বয়ে চলে বুরুজে, আর চূড়ায় টানানো পতাকা উড়ছে পতপত করে।

জাহাজঘাটায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে কিছু লোক।

খাড়াইয়ের চূড়ায় মুহূর্তের জন্য থামল তানিয়া। তার দৃষ্টি চলে যায় নদীর জলে। পাহাড়ি জঙ্গলের কোলঘেঁষে বয়ে চলা এ নদীর জল আয়নার মতো স্বচ্ছ। কত বড় নদী! নদীর জলে ছায়া পড়ে পাহাড়ের, কিন্তু তা বড়ই ক্ষুদ্র নদীর বিশালতার কাছে। এ নদীই জন্ম দিয়েছে তানিয়ার অভিলাষের, মন যেতে চায় সেখানে যেখানে ডিঙ্গো নামের বুনো কুকুর দেখতে পাওয়া যাবে, হয়তো এ নদীর শেষ সীমানায় তার অধিষ্ঠান।

একটা বোট তার নজরে আসে। বোটের কালো ধোঁয়া থাকের উপরে থাকে ভাসে যেন বোশেখের মেঘদল। মুহুর্মুহু গর্জনে কেঁপে ওঠে সিডার গাছের সারি।

নদীর বুকে বোটকে নিতান্তই একটা ফুটকির মতো লাগে, কিছুক্ষণ পরে হয়তো মিলিয়ে যাবে দৃষ্টিসীমার বাইরে।

তানিয়া ঢাল বেয়ে তড়িঘড়ি করে নামতে শুরু করল। বোটটি জাহাজঘাটার বার্থে ভিড়তে আরম্ভ করতেই জনাকীর্ণ জাহাজঘাটায় ধাক্কা লেগে হেলে পড়ল একপাশে, আর পিপেগুলো গড়িয়ে পড়ল যেভাবে জুয়ার বোর্ডে লোটো গুটি গড়িয়ে পড়ে।

বোটের সামনে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা রুমাল নাড়ছে। তানিয়ার জন্য কি কেউ রুমাল নাড়ছে?

মুহূর্তেই তার মুখ মলিন হয়ে গেল। সে নিজেই যাত্রীদের উদ্দেশে হাত নাড়তে শুরু করল এই আশায় যদি ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখে চিনতে পারে।

কিন্তু সেই আশার গুড়ে বালি। বাবা তাকে শেষবার দেখেছিলেন শৈশবে। কীভাবে তানিয়া আশা করতে পারে আজ এত বছর পরে তাকে দেখেই চিনতে পারবে? সে কোনো চিন্তা না করেই এই জনাকীর্ণ জাহাজঘাটায় দৌড়ে এসেছে। সে কেন এমন ত্বরিত অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিল? তার বুকের ধুকপুকানি বেড়েই চলেছে, হৃদস্পন্দন থমকে যাবে না কি আরও বাড়বে, দ্বিধান্বিত মন ভাবতে পারে না।

ফুলগুলো সব আঁকড়ে ধরে তানিয়া জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে রইল। সেখানে অসংখ্য পিপে, পাশেই টাইগার তার মন ভালো করার অভিপ্রায়ে পা চাটতে লাগল।

লোকজন তানিয়াকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। একটা পরিবার আসছে, মাঝের বয়স্ক লোকটার মাথায় চকচকে ফেল্ট টুপি,তার পাশে বয়স্কা নারী, আর অন্যপাশে পাতলা দুবলা শরীরের একটা ছেলে, দেখে মনে হয় এই হচ্ছে কলিয়া। কিন্তু না, ওরাও তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। হতে পারে তারা ভেবেছিল অভ্যর্থনা জানাতে কেউ আসবে না।

একটু দূরে কয়েকজন মানুষ এগিয়ে আসছে, ওখানেও তিনজনা। মোটাসোটা এক লোক, মাথায় কাপড়ের টুপি, সাথে অল্পবয়স্কা এক নারী, পাশে লোকটারই মতো নাদুসনুদুস একটা ছেলে। আগের জনের থেকে একেই বরং বেশি মানায় কলিয়া হিসেবে।

তানিয়া সামনে এগোল। লোকটা নিষ্প্রাণ চোখে তাকালেন, সাথে থাকা ছেলেটি তানিয়ার হাতে ধরা ফুলগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলল, ‘তুমি কি এগুলো বিক্রি করছ?’

তানিয়া কেঁপে ওঠে। চোখেমুখে তার অপমানের ছাপ।

দ্রুত চলে গেল সেখান থেকে। পিপের সারির আড়ালে দাঁড়াল যতক্ষণ-না জাহাজঘাটা জনশূন্য হয়। পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। কেন সে এতক্ষণ অপেক্ষা করে রইল? হয়তো তারা আসেনি।

পিপেগুলোর পিছন থেকে বের হলো তানিয়া। জাহাজঘাটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখা গেল, কিছু স্বাস্থ্যকর্মী স্ট্রেচার নিয়ে জাহাজঘাটায় ছুটছে। শুধু ওরাই আছে এখানে। সে ওদের পিছুপিছু চলল।


ТЕНЕВ

একটা বালক স্ট্রেচারে শোয়া, তার কোমর অবধি কম্বল দিয়ে ঢেকে দেওয়া। তার আরক্ত মুখ জ্বরগ্রস্ত, কিন্তু তার চেতনা ছিল, হয়তো পড়ে যাওয়ার ভয়েই স্ট্রেচারকে দুই হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রইল। মুখে তার অস্বস্তি, কিন্তু তাতে হাসি লেগে ছিল।

'কী হয়েছে ওর?' একজন স্বাস্থ্যকর্মীকে জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'ম্যালেরিয়া,' নিরসমুখে জবাব দিলো লোকটি।

তানিয়া তাদের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে ছেলেটি ভীত চোখে তাকাল।

'তুমি কাঁদছিলে?' তানিয়াকে জিজ্ঞেস করল ছেলেটি।

তানিয়া দুই হাত-ভরা ফুল দিয়ে মুখ ঢাকল। ফুলের সুবাস নেওয়ার ভান করল সে। কিন্তু ছেলেটা কি জানে এই উত্তর দেশের ফুল সুবাসহীন?

'তুমি কাঁদছিলে,' এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলল ছেলেটি।

'না, তোমার কেন এরকম মনে হলো?' তানিয়া ফুলগুলো স্ট্রেচারে তার পাশে রাখতে রাখতে বলল।

'আমি কাঁদছিলাম না, একটা মোটা ছেলে আমার চোখে বালু ছুড়েছিল।'

একসময় জাহাজঘাটা শূন্য হয়ে গেল। একটা লোক বোটের সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় একাকী একটা মেয়েকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে দেখল। বড্ড বিষণ্ন মেয়েটির মুখ।

****

পাঁচ

স্কুলের প্রথম দিন তানিয়ার সহপাঠীদের জন্য আনন্দের হলেও তার জন্য ছিল বেদনার।

স্কুলের মাঠ পেরিয়ে বারান্দায় আসার আগেই ঘণ্টা বেজে গেছে।

ঢং ঢং ঢং।

ভারী দরজা ঠেলে বারান্দায় ঢোকার পরে দেখা গেল মাঠের মতোই এটা ফাঁকা আর নীরব। সে কি দেরি করে ফেলেছে?

'না,' দারোয়ান জবাব দিলো। 'শিক্ষকেরা এখনো যাননি ক্লাসে। কিন্তু তুমি আরও আগে আসতে পারতে!'

তার আর দৌড়ানোর শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। পাহাড় বেয়ে উঠবার মতো ছোটছোট কদম ফেলে চকচকে, লম্বা বারান্দাটা পার হলো।

স্কুলের দেওয়ালে প্ল্যাকার্ড ঝুলছে, গোটা দশেক জানালার কাচে প্রতিফলিত হয়ে সূর্যের কড়া রোদ ঝিলিক দিচ্ছে প্ল্যাকার্ডের আল্পনা আর লেখাগুলোতে :

‘স্কুলে স্বাগত!

নতুন বর্ষের শুরু!

ভালোভাবে পড়াশোনা করো এবং নিজের সেরাটা দেখাও!’

চুলে বিনুনি করা ছোট্ট একটা মেয়ে তানিয়াকে ভেংচি কেটে বলল, ‘ich bin, du bist, er ist!’ (টীকা : জার্মান ভাষায়–তুমি হও, আমি হই, সে হয়) কী চঞ্চল আর সরু দুটি পা মেয়েটির! তানিয়া যেন নিজেকেই দেখতে পেল ওর মাঝে। মনে হলো সে নিজেই নিজেকে ভেংচি কেটেছে।

হঠাৎ ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গেল মেয়েটা। তানিয়া শ্রেণিকক্ষের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। দরজা ভেজানো ছিল। ভেতর থেকে চাপা কোলাহল শোনা যাচ্ছে। এই হইচই বড্ড তৃপ্তির, যেমনটা পাওয়া যায় নদীর কলতানে, অথবা বনের মর্মর ধ্বনিতে, এতগুলো বছর ধরে এই সুরের জগতকেই সে ভালোবেসেছে, তার স্মৃতির বড় অংশ জুড়ে রয়েছে এইসব সুর।

নিজের মনের সাথে বোঝাপড়া শেষে সিদ্ধান্ত নিল, ‘যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়, ভুলে যাও ওসব।’

একটা বড় দম নিয়ে সজোরে ধাক্কা দিলো দরজাটায়। তাকে দেখামাত্র ভীষণ হইচই করে উঠল ক্লাসের সবাই। তানিয়া প্রশান্তি-ভরা মুখে ক্লাসে ঢুকল। তার মনে হলো সে যেন তুষারপাতের মাঝ দিয়ে হেঁটে চলে এলো, তার দৃষ্টি অল্প সময়ের জন্য ঝাপসা হয়ে গেছে তুহিন কুয়াশায়, কারও মুখ আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবুও সে হাসি মুখে বরণ করে নেয় সবার ভালোবাসার উষ্ণতা, বুঝতে পারে না-বলা কথার মাঝের মিতালি।

‘তানিয়া, এদিকে আয়, আমাদের সাথে বস, তানিয়া!’ তার সহপাঠীরা চেঁচিয়ে ডাকল।

ফিল্কা তার ডেস্কে যোগব্যায়াম করে দেখাচ্ছিল, যদিও এ কাজে তার চেয়ে চৌকস কেউ নয়, তবুও তাকে মনমরা লাগছিল।

তানিয়া হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে ঝেনিয়ার পাশের ডেস্কে বসে পড়ল আর ফিল্কা তার পিছনের ডেস্কে বসে পড়তেই রুশ ভাষার শিক্ষিকা আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা শ্রেণিকক্ষেচলে এলেন।

তিনি সোজা হেঁটে মঞ্চে উঠে দাঁড়াতেই আবার নিচে নেমে পড়লেন। মনে মনে বললেন, “যদি রঙিন চার টুকরো কাঠ তাকে অন্য সবার চেয়ে উঁচুতে তুলে আনে, তাহলে ‘সব মানুষের পৃথিবী’ আর রইল কোথায়!”

তিনি ছাত্রছাত্রীদের মাঝে চলে এলেন, যাতে তার আর ওদের মাঝে দূরত্ব তৈরি না হয়।

অল্পবয়স্কা শিক্ষিকা আলেকসান্দ্রা ইভানোভনার চেহারার জেল্লা আর সৌম্য দৃষ্টির সামনে ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্ট ছেলেও মনোযোগী হতে বাধ্য। তার কালো সাজপোশাকে সবসময় জ্বলজ্বল করে ছোট্ট একটা গার্নেট পাথর।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ছাত্রছাত্রীরা তার তারুণ্যকে কখনোই অনভিজ্ঞতা হিসেবে বিচার করে না। তারা আলেকসান্দ্রা ইভানোভনার সাথে ঠাট্টা করে না।

‘শুভ সকাল! সোনামণিরা,’ কিছুটা ভারি স্বরে তিনি বললেন। মনে হলো যেন গ্রীষ্মকালীন অবকাশের পরে গলাটা বাজিয়ে নিতে চাইছেন। তার গলার স্বরও দৃষ্টির মতোই মায়াবী, মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।

‘আজ আমাদের বিশেষ দিন। নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরু। তোমাদের মাঝে আবারও আসতে পেরে আমি আনন্দিত। বিগত বছরগুলোর মতো এবারও তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছি। তোমরা বড় হয়ে গেছ সবাই, আর আমি কিছুটা বুড়িয়ে গেছি। কিন্তু আমরা আমাদের সেরাটা দেওয়ার প্রচেষ্টা করে গেছি সবসময়, এবং- '

নতুন টার্মের শুরুতে বরাবরের মতো যেভাবে তিনি বক্তৃতা দেন, সেভাবেই সবকিছু শুরু হতো যদি না ক্লাসে দুইজন নতুন ছাত্রের আগমন হতো।

এদের দুইজনকেই তানিয়া ভোরবেলায় জাহাজঘাটায় দেখেছে। এদের মধ্যে একজন লম্বা, তাল-ঢ্যাংগা আরেকজন খাটো,গাট্টাগোট্টা আর তার ফোলা ফোলা গালে তাকে দুষ্ট দুষ্ট লাগছিল।

আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা তাদের নাম জানতে চাইলেন।

‘গোদিলো গোদলেভস্কি,’ মোটা ছেলেটি উত্তর দিলো।

‘বশ,’ শীর্ণকায় ছেলেটি উত্তর দিলো।

‘তাহলে তারা আসেনি,’ তানিয়া মনে মনে বলল। ভারমুক্ত বোধ করল সে এবং আবারও নিজেকে বলল, ‘ঠিক আছে, আপাতত ভুলে যাই এসব।’

নতুন ছেলে দুটির অদ্ভুত নাম শুনে ক্লাসে হাসির রোল পড়ে গেল। সত্যি বলতে এরকম শুরু কোনো শুভ ইঙ্গিত বহন করে না, কিন্তু আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা বললেন, ‘পড়ায় মনোযোগ দাও সবাই। আমি আশা করছি তোমরা ভুলে যাওনি যা শিখিয়েছি তোমাদের।’

ফিল্কা সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন তার দিকে,কিন্তু সে দৃষ্টি কঠোর ছিল না। এবারের মতো তিনি ক্ষমা করলেন। আজকের দিনটা নবীনদের, এবং তিনি চাইলেন ওরা আজ আনন্দে থাকুক।

‘এভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললে কেন, ফিল্কা?’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

ফিল্কা উঠে দাঁড়াল।

‘আমি আজ খুব ভোরবেলায় উঠেছি এক বন্ধুকে চিঠি লেখার জন্যে,’ ফিল্কা বলল। ‘কিন্তু চিঠিটা শেষ করতে পারিনি, কারণ আমি যতিচিহ্নের ব্যবহারবিধি ভুলে গেছিলাম এই বাক্যে—আমার প্রিয় বন্ধু আজকে খুব সকালে কোথায় গেছিলে?’

‘শুনে খুব খারাপ লাগছে,’ আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা ব্যথিত চোখে তাকালেন। এরপর তিনি তানিয়ার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন।

কিন্তু তানিয়া মাথা নিচু করে বসেছিল, অগত্যা শিক্ষিকা বললেন, ‘তানিয়া সাবানেয়েভা, আমি আশা করছি তোমার নিয়মগুলো মনে আছে। বলো তো।’

‘মানে কী?’ তানিয়া ভাবল। ‘সে তো আমাকে নিয়ে একথা বলেছে, আমি নিশ্চিত। সবাইকে কেন এত নিষ্ঠুর হতে হবে? কেন সবাই এমনকি ফিল্কাও আমাকে মনে করিয়ে দেয় যা আমি ভুলে যেতে চাই।’

উচ্চৈঃস্বরেসে উত্তর দিলো, ‘একটি বাক্যে সম্বোধনের পরে কমা অথবা বিস্ময়চিহ্ন বসাতে হয়।’

'বুঝলে এবার?' ফিল্কার দিকে তাকিয়ে আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা বললেন। 'তানিয়ার মনে আছে ব্যবহারবিধি। এসো,এখন ব্ল্যাকবোর্ডে এরকম একটা বাক্য লিখে ফেলো, ফিল্কা।'

ফিল্কা ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে একটুকরা চকখড়ি হাতে নিল।

তানিয়া এক হাতে মুখ ঢেকে তাকিয়ে রইল নিচের দিকে, যাতে তার মুখ আড়াল করতে পারে। কিন্তু ফিল্কা ভাবল তাকে অসুখী লাগছে এবং সে মরিয়া হয়ে চাইল যাতে তার বলা কথায় কষ্ট না পায়।

'তার কি হয়েছে?' সে মনে মনে বলল।সে ব্ল্যাকবোর্ডে চকখড়ি ঘষে লিখল :'খুশি হও, বন্দু!'

শিক্ষিকা হতাশায় মাথা দোলালেন।

'ওহ, ফিল্কা, ফিল্কা,' ভর্ৎসনার সুরে তিনি বলেন, "তুমি সব ভুলে গেছ, সব। বিস্ময়চিহ্ন ঠিক জায়গায় ব্যবহার করলেও 'বন্ধু' বানানে ভুল করেছ।"

'ওহ, হ্যাঁ, এটা তো ক্রিয়াপদ,তাই না!' অকুণ্ঠচিত্তে ফিল্কা বলে উঠল।

'ক্রিয়াপদ!এটাও মনে নেই? কেন এটা ক্রিয়াপদ?' শিক্ষিকা উত্তেজিত স্বরে বললেন।

'আমি এটাই জানি,' ফিল্কা একগুঁয়েমি স্বরে বলল। 'বন্ধু, তুমি কি করছ বন্ধু? দেখুন–এই তো।'সে হড়বড় করে বলল। ফিল্কার কথা শুনে হুল্লোড় বয়ে গেল ক্লাসে। হাসির শব্দে মাথা তুলে তাকাল তানিয়া। ফিল্কার কাণ্ড দেখে সে হেসে উঠল। ওর হাসির শব্দে পুরো ক্লাস গমগম করে উঠল। প্রশান্তিতে ভরে গেল তার মুখ।

ফিল্কা মুচকি হেসে চক-খড়ি ফেলে দিলো। তার খুব খুশি লাগল।

আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা দেয়ালের পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন,কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইলেন ফিল্কার দিকে। ফিল্কার মতো চতুর আর করিৎকর্মা ছেলে এরকম মহা ভুল করে কী করে খুশি হতে পারে! কোনো একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। বাচ্চারা লুকোচ্ছে কিছু একটা অথচ তিনি ভাবতেন ওদের সবকিছু জানেন!

****

হাসপাতালের ডিউটি শেষে বাড়ি ফেরার পরে তানিয়ার মা বাগানের সবুজ ঘাসে বসেন। অবশ্য সচরাচর সেই সুযোগ হয় না। তানিয়ার কাছে এই মুহূর্তটি ভীষণ প্রিয়।

এই শরতে ঘাস মলিন আর হলুদ হয়ে আছে। ফুলের বেডও খাঁখাঁ করছে। তবুও তা একইরকম আনন্দের!

তানিয়া তার মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে, তখন ঘাসের বিছানা কী আরামের মনে হয়!

বিশাল আর দীপ্তিমান আকাশের নিচে তারা দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকে। মাছ শিকারের জন্য ঈগল পাখি শূন্যে পাক খেয়ে উড়ে বেড়ায় নদীর মোহনার ওপর। ঈগল পাখি পাখা না ঝাপটিয়ে ভেসে চলে, যতক্ষণ-না উড়োজাহাজ এসে বিরক্ত করে। উড়োজাহাজের গর্জন বনের মাঝ দিয়ে এসে ম্লান হয়ে যায়, আর এই বাগানে প্রায় অস্পষ্ট লাগে। এই শব্দ শুনতে পাওয়ার সাথে সাথেই হারিয়ে যায়, কিংবা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়, তখন মা-মেয়ে চুপ করে থাকে, এটাই তাদের নিয়ম।

কিন্তু আজ অস্পষ্ট শব্দ শুনেও তানিয়ার মা বলে উঠলেন, 'তাহলে ওরা আসেনি। আমাদের মাঝে কত দূরত্ব!'

তানিয়া নীরব রইল।

ফুলের বেডে ফুলহীন কিছু শিকড়ের দিকে ইঙ্গিত করে তানিয়ার মা জিজ্ঞেস করলেন, 'আইরিশ ফুলগুলো কোথায়?' তোমার এই ছোট্ট বাগানটা কী মনোরম ছিল! পেটুক হাঁসটা কি সব গপাগপ গিলেছে?'

'আজ সকালে তাড়া করেছি দুষ্টটাকে,' তানিয়া নিশ্চল হয়ে বলল।

'মস্কো'তে মার্শলিলি জন্মায় না,' তার মা আক্ষেপ নিয়ে বললেন। 'তোমার বাবা এই ফুলটি খুব পছন্দ করতেন। আমি আশা করেছিলাম তুমি তাকে একতোড়া মার্শলিলি উপহার দেবে।'

তানিয়া চুপ করে রইল।

তার মা আরও বলে চললেন, 'তিনি একজন ভালো মনের মানুষ, মা আমার।'

তানিয়া আচমকা উঠে দাঁড়াতেই আবার মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

'তুমি কি কিছু বলতে চাও?' ধীরে ধীরে তার মা জিজ্ঞেস করলেন।

'তিনি যদি ভালো মনের মানুষ হয়ে থাকেন, একজন হৃদয়বান হয়ে থাকেন, তাহলে কেন তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন?'

তানিয়ার কণ্ঠে ক্ষোভ ঝরে পড়ছিল।

তার মা হতচকিত হয়ে এমনভাবে নড়েচড়ে বসলেন যেন তার কনুইতে ধারালো পাথরের ঘষা লেগেছে।

তানিয়া তার কণ্ঠে রূঢ়তা টের পেয়ে তার মায়ের পায়ের কাছে বসে পড়ল এবং তার মায়ের হাত আর মুখ চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে তুলল।

কত শান্তি আর আনন্দের জীবন ছিল তাদের! মাথার ওপরে সীমাহীন আকাশ আর নিচে সবুজ ঘাসের বিছানা। কী করে সে তার বাবাকে ভালোবাসতে পারে যেখানে তার কথা উঠলেই তাদের আনন্দ মিইয়ে যায়!

'এ ধরনের কথা আর বলব না, মা,' তানিয়া বলল। 'আর কক্ষনো না। তারা আসেনি দেখে ভালো লাগছে। আমরা নিজেরা সুখেই আছি, তাই না? আর ফুল নিয়ে ভেবো না। আমি নতুন চারা লাগাব। জলার জায়গাটা আমি চিনি। কত যে ফুল ফুটে আছে ওখানে! আমি ওখান থেকে চারা নিয়ে আসব। আমাদের বাগানটা আরও সুন্দর হবে। আরও।'

সে সাতকাহন বলে চলল, কি যে বলছে সে নিজেও বুঝতে পারছে না, এমনকি গেটে হুড়কো নাড়াচাড়ার শব্দ কিংবা গেট খোলার জন্য তার মায়ের ডাকও শুনতে পায়নি।

‘তানিয়া, দেখো তো,’ তার মা তৃতীয়বারের মতো ডাকলেন। ‘কে যেন এলো, দেখো তো মা,হয়তো হাসপাতাল থেকে এলো কিনা!’

অবশেষে তানিয়া উঠে দাঁড়িয়ে তড়িঘড়ি করে গেটের সামনে গেল। গেট খুলতে বিরক্ত লাগছিল তার, এমনকি আগন্তুক যদি রোগীও হয়।

তানিয়া গেটের এপাশ থেকে ডাকল, ‘কী দরকার?ডাক্তারকে চাচ্ছেন? আপনি কি রোগী?’

কিন্তু তানিয়া ফৌজি উর্দি পরা লম্বা আর বিশালদেহী এক লোককে দেখল। কোনো কথা না বলে তিনি তানিয়ার দিকে মুচকি হেসে তাকালেন। কী অদ্ভুত আচরণ!

হঠাৎ তার মা পিছন থেকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলেন। অর্ধনিমীলিত চোখে টলতে টলতে তিনি গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

তাহলে এই মানুষটি তার বাবা!



তারা বাবা এগিয়ে আসলেন তার মায়ের কাছে, হয়তো চুমু খাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছুটা সামনে ঝুঁকতেই তার মা পিছনে সরে এসে হাতটা বাড়ালেন। তার বাবা বিনয়ের সাথে তার হাতখানা ধরে রইলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। এরপরেই এত দ্রুত তানিয়ার দিকে তার দুই বাহু বাড়িয়ে দিলেন যে, তার চামড়ার বেল্ট কটকট করে উঠল। তানিয়া অজান্তেই ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার ললাটে চুমু খেলেন তার বাবা। তার বাবার কাছে আসতেই তার গা থেকে ভুরভুর করে চামড়ার গন্ধ বেরুতে লাগল।

'কত বড় হয়ে গেছ! আমার আসলে তোমার জন্যে ক্যান্ডির বদলে ফুল আনা উচিত ছিল।'তার বাবা স্মিত হেসে বললেন। তিনি তার ব্যাগের কাছে ফিরে একটা বাক্স বের করতে বেশ কসরত করতে লাগলেন। চঞ্চল বাচ্চাদের মতো তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে, আর তানিয়া ভেবে চলল, ইনি কি ভালো মনের মানুষ যেমনটা তার মা বলেছেন?

অবশেষে বাক্সটা বের করে তানিয়ার হাতে তুলে দিলেন। সে বাক্সটা হাতে নিয়ে ভাবতে পারল না এখন তার কী করা উচিত?

জলের পিপের কাছে পুরোনো স্লেজগাড়ির ওপরে বাক্সটা রেখে দিলো সে। বাক্সের ওপরে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে, মাঝের এই নীরবতার সময়ে জল পড়ার টপটপ শব্দ যেন বাজ পড়ার কড়কড় শব্দ মনে হয়। বিভ্রম লাগে তার।

এমন সময় টাইগার ও কসাক তাদের ছানাপোনাসহ বাক্সের কাছে এসে গন্ধ শুঁকতে লাগল। তানিয়ার মা মাথা নেড়ে মিষ্টির বাক্সটা ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। তানিয়া বাগানেই রয়ে গেল, তার বাবা আরও একবার তার দিকে দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে চুমু খেলেন।

মিষ্টির বাক্স নিয়ে কসরত পর্ব শেষ হওয়ায় তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। বেশ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে লাগলেন। যদিও তার কণ্ঠে উত্তেজনা টের পাওয়া যায় না। তিনি হাসলেও তার মুখের ইতস্তত ভাবটা কেটে যায়নি।

'তুমি জাহাজঘাটায় ছিলে না। নাদিয়া আর আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবে। কলিয়ার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছিল, আমরা অপেক্ষা করছিলাম স্ট্রেচার আর অ্যাম্বুলেন্সেরজন্য। তুমি ভাবতে পারো, কে একটা মেয়ে জাহাজঘাটায় তাকে এক তোড়া ফুল দিয়েছে! সেই মার্শলিলি ফুলগুলো কতদিন দেখিনি! মেয়েটা স্ট্রেচারে তার পাশে ফুলগুলো রেখে গিয়েছিল। সে আশা করেছিল ঐ মেয়েটা তুমি হবে। কিন্তু না, তুমি গেলে না।'

তানিয়া তার কপালের পাশটা হাত দিয়ে চেপে ধরে, তার মনে হচ্ছিল যেকোনো মুহূর্তে রক্তনালী ছিঁড়ে তার মুখে রক্তের ধারা বয়ে যাবে!

'কোনো সমস্যা হয়েছে, তানিয়া?' তার বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

'এত জোরে কথা বলবেন না, বাবা,' সে বলল। 'আমি আপনার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ যেন নিস্তব্ধতা গ্রাস করল পুরো বাগানটাকে। তার বাবা চুপ হয়ে গেলেন। থমথম করছে তার মুখ। হাসি মিলিয়ে গেল তার মুখ থেকে। কিন্তু তার চোখজোড়া আগের মতোই দরদি। তিনি কাশলেন, কেন যেন অদ্ভুত হলেও এই কাশিকে বড় পরিচিত লাগল। তানিয়াও প্রবলবেগে কাশতে লাগল, মনে হলো, এক দমকা শীতল হাওয়া যেমন আনমনা করে তোলে, তেমনিভাবে তাকে যেন বিষণ্ন করে তুলল।

তার বাবা তার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে সজোরেকাঁধে চাপ দিলেন।

'আমি জানি, আমার প্রতি তোমার ক্ষোভ আছে, তানিয়া,' তিনি বললেন। 'কিন্তু আমরা তো বন্ধু হতে পারি, তাই না?'

'আপনি চা খান খাবেন?' তানিয়া এমনভাবে বলল যেন কিছুই হয়নি।

'এই না হলে আমার মেয়ে!' তার বাবা তার কাঁধে চাপ দিয়ে কোমল স্বরে বললেন।

তানিয়া তার বাবার কণ্ঠে শ্লেষ অনুভব করল। সে মোলায়েম স্বরে বলল, ‘বাবা, আসেন, আমাদের সাথে চা খান।’

সে অনুভব করল তার চোখজোড়া ছলছল করে উঠছে, ‘আমি এখনো আপনার সাথে অভ্যস্ত হতে পারিনি।’

তিনি ওর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ওর গালে হাত রাখলেন।

‘হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ,’ প্রায় ফিসফিস স্বরে বললেন।

‘পনেরো বছর বয়সে এসব মেনে নেওয়া কঠিন, খুব কঠিন। তবে,আমরা ভালো বন্ধু হতে পারি। চলো, এক কাপ চা খাওয়া যাক।’

তানিয়ার বাড়ির বারান্দায় এই প্রথম একজোড়া অপরিচিত ভারী বুটজুতোর শব্দ শোনা গেল।তার বাবার পায়ের আওয়াজ।

****

সাত

কলিয়া সাবানেয়েভার সাথে তানিয়া সাবানেয়েভার কী সম্পর্ক, তারা চাচাতো ভাই-বোন কিনা, এ নিয়ে স্কুলের বন্ধুরা ভীষণ উৎসুক। তানিয়া কাউকে উত্তর দেয় ‘হ্যাঁ’, আবার কাউকে ‘না’। তানিয়ার নির্লিপ্ত উত্তর শুনে উভয় পক্ষই আর প্রশ্ন করে না। আর ফিল্কাও এ কয়দিন মারোসিকা নামের দেশ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছে। তাই আর তানিয়াকে প্রশ্ন করার সাহস পায় না।

তবে, পিছনের ডেস্কে বসে সে তানিয়ার মাথা দেখতে ভালোবাসে। মানুষের মাথার দিকে তাকিয়ে কত কিছু যে বলে দেওয়া সম্ভব!

কখনো দেখতে পাথরের মতো শীতল আর নিরেট মনে হয়, যে পাথর ক্যাম্পফায়ারে কাজে লাগে; আবার কখনো তৃণপত্রের মতো প্রাণময় আর কোমল লাগে।

তানিয়ার মাথা দেখে মনে হচ্ছিল তা একইসাথে শীতলআর নিরেট, আবার পরক্ষণেই প্রাণময় আর কোমল। কিন্তু একটা জিনিস নিয়ে সন্দেহ নেই, আর তা হলো তানিয়ার জেদ। জেদটা হচ্ছে পিছনে ফিরে ফিল্কা ও কলিয়ার কাণ্ডকারখানা না দেখা।

তানিয়া কার জন্যে এরকম ভাবে?

ফিল্কা সবসময়ই সবকিছুতে আশাবাদী। সে ভাবল তানিয়া হয়তো তাকে দায়ী করে না কখনো। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে, তানিয়া গর্ব করে কলিয়াকে নিয়ে। এটা ঠিক নয়।

কলিয়ার সরু হাত আর রোগা মুখের গর্ব করার কী আছে, ভেবে পায় না সে।

ফিল্কা যখন কলিয়াকে ‘গন্ধক’ দেখায়, সে এটাকে চিনতে পারেনি। ক্লাসে সবার কাছেই এটা জনপ্রিয়।

‘ফার গাছের আঠা,’ ফিল্কা বুঝিয়ে বলল তাকে। ‘এগুলো তুমি চীনা ফেরিওয়ালাদের কাছে পাবে, “চাই চুইংগাম, চাই চুইংগাম!” বলতে বলতে রাস্তায় বিক্রি করে তারা। পঞ্চাশ কোপেকে বড়সড়ো একটুকরো পাওয়া যায়।’

‘চুইংগাম কি জিনিস?’ কলিয়া জিজ্ঞেস করল।

‘ওরে ভাই!’ ফিল্কা বিরক্ত হলো। ‘তুমি আজকেই সব জেনে যাবে?’

কিন্তু কলিয়া কোনো রাগ করল না এ কথায়।

‘খুব ভালো কথা। আমি নিজেই খুঁজে নেব।’সে বলে চলল,‘তোমরা না বড্ড অদ্ভুত!আঠা যে চিবানো যায় এই প্রথম জানলাম।’

পরের দিন ক্লাসে সে বড়একটুকরো চুইংগাম কিনে নিয়ে এসে অন্য সবার মতো কটমট শব্দ করে চিবিয়ে খাচ্ছিল। সে ফিল্কা আর তানিয়াকে কিছুটা ভাগ করে দিলো। তানিয়া ভাবল, ছেলেটা তো মন্দ না! তাই তার দিকে চেয়ে হাসল। তানিয়ার সাদা দাঁতগুলো আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল।

‘ওরে, আঠার কী তেলেসমাতি!’ উচ্ছ্বাস লাগে কলিয়ার কণ্ঠে। ‘কী চমৎকার!আঠা চিবুতে চিবুতে দাঁতগুলো কী সুন্দর হয়েছে!’

‘আমাকে একা থাকতে দিলে আরও চমৎকার হবে!’ তানিয়ার কণ্ঠে ক্ষোভ ঝরে।

কলিয়া হাসলেও তৎক্ষণাৎ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না, কিন্তু বরফ শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

তার চোখে একগুঁয়েমিভাব টের পেল তানিয়া।

‘হু, আঠা বেশ চমৎকার! ওটাই বলতে চেয়েছিলাম,’ কলিয়া ধীরে ধীরে বলল।

এটা আদৌ ঝগড়া ছিল কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না তানিয়া, কিন্তু তাদের মধ্যে মন কষাকষি রয়ে গেল। রোগাটে ছেলের ছবি তার বারবার মনে পড়তে লাগল।

রবিবারে তানিয়ার নিমন্ত্রণ তার বাবার বাসায়। সেখানে যেতে তার বাড়ির পিছনের ছোট্ট বন পার হয়ে দুর্গের দিকের রাস্তায় উঠতে হয়। কাছেই পাহাড়ের কোলঘেঁষে বয়ে চলেছে নদী, আর রাস্তাটা দুই দিকে বেঁকে গেছে নদীতীর ঘেঁষে। সে খুব দ্রুত ডাইনে-বাঁয়ে দৃষ্টি হেনে ধীরলয়ে হেঁটে চলল। বারেবারে ফিরে দেখছে নদীকে। নদীতীরে স্রোতের তোড়ে মাটির ঢেলা ঝুপ করে পড়ে জলে। আজ ব্যস্ততা না থাকলে হয়তো এসব দেখার অবসর পেত। তানিয়ার পিছুপিছু টাইগারও কান পাতল। আধাঘণ্টার মধ্যেই তারা তার বাবার বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল।

শানবাঁধানো রাস্তায় চুন-সুরকির আস্তর দেওয়া। নুড়িপাথরের মাঝে উঁকি দেয় সবুজ ঘাস আর চুনের ছোপে সাদা হয়ে আছে ঘাসের ডগা।

চারপাশ সুনসান। কাচের দরজাটা আধভেজানো। টাইগারকে বারান্দায় রেখে তানিয়া ঘরের মধ্যে আসে।

যদি উলটোটা হতো! কুকুরের বদলে তার বারান্দায় বসে অপেক্ষা করা তার জন্য বেশি স্বস্তিদায়ক হতো।

তার মানে এই নয় যে, কেউ ওখানে তার সাথে প্রীতিময় ব্যবহার করে না। নাদিয়া এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানায়। কী মিষ্টি তার ব্যবহার! তানিয়ার কাঁধে চাপড় দেয় আর চুমু খায় ললাটে।

‘তানিয়া! এসেছ তুমি!’

তার মোলায়েম কণ্ঠে আন্তরিকতা থাকলেও তানিয়া কেন যেন তা বিশ্বাস করতে পারে না।

‘আমাকে চুমু খাওয়ার সময় বাবার মুখের দিকে তাকাতে হবে কেন তার?’ সে ভাবে। মনে হচ্ছে সে বাবাকে বলছে, ‘দেখো, তোমার মেয়েকে আমি কত ভালোবাসি। তুমি কিংবা তানিয়া আমাকে অভিযোগ করতে পারবে না।’

এই সমস্ত ভাবনার পরে তার আর কথা বলতে ভালো লাগে না। উঠে গিয়ে যখন তার বাবার হাত ধরে, তখন সে স্বস্তি পায় কিছুটা।

কলিয়ার সাথে কথা বলাও সহজ হয় তখন।

‘হ্যালো, তানিয়া,’ কলিয়া বিনয়ের সাথে উত্তর দেয়। কিন্তু সে আগ বাড়িয়ে তানিয়াকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। তার বাবা কিছু বলেন না, শুধু তার চিবুক স্পর্শ করে আদর জানান আর তাড়া দেন খাবার টেবিলে বসার জন্য।

তাদের খাবার টেবিলে বাহারি পদের আয়োজন থাকে। আলুর দম,হরিণের মাংসের পদ। তুঙ্গাস শিকারীদের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল হরিণের মাংস। তারা বেছে বেছে চাক করা আলুর দম প্লেটে নেয়, আর চেয়ে চেয়ে কলিয়ার কীর্তি দেখে হাসাহাসি করে।

কলিয়া পুরো আস্ত একটা আলুর দম মুখে পুরে গেলার চেষ্টা করছিল। মাঝেমধ্যে তার বাবা কলিয়ার নাকে আলতো করে ঘুষি মেরে খুনসুটি করে, আর তাতেই অভিমানে কলিয়ার চোখে জল আসে।

‘বাবা! তুমিও!’ আবেগে থরথর করে তার গলা। ‘বোকামো কোরো না, আমি আর বাচ্চা নই।’

‘একদম ঠিক, তুমি আর বাচ্চা নও, কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া হয়েছ,’ বাবা বলে উঠলেন। ‘চেরি পাই খাওয়ার সময় তুমি কীভাবে সামলাও, আমরা দেখব।’

কলিয়া সলজ্জ চোখে তানিয়াকে একনজরে দেখল।

তানিয়া ভাবল, ‘চেরি পাইয়ের গল্প দিয়ে আমার কী আসে যায় যদি বাবা আমাকে কলিয়ার মতো ভালো না বাসেন? কই, আমার সাথে তো মজা করেন না, নাকে ঘুষিও দেন না, কিংবা আমার প্লেট থেকে মাংসের টুকরাও কেড়ে খান না। কলিয়ার মতো তাকে আমি “বোকা বাবা” ডাকতে পারব? নাকি তারা ভাবে আমি এখানে কেবল চেরি পাই খাওয়ার লোভে আসি?’

তার বুকে ব্যথা করে ওঠে, ক্রমশ পুরোনো ব্যথাটা চাড়া দিয়ে ওঠে।যদিও সে সবাইকে ভালোবাসে, নাদিয়ার গলার রিনরিনে স্বর, মায়াবী মুখ, তাদের প্রথম দেখা হওয়ার সময় ছলছল করে ওঠা তার চোখজোড়া, এখনো ভুলেনি। সে ভালোবাসে তার বিশালদেহী বাবাকে, ভালোবাসে সোফায় পড়ে থাকা বোটকা গন্ধওয়ালা বাবার চামড়ার বেল্টকে। ভালোবাসে বাগাতেল বোর্ড খেলার সময় পিনবলের টুংটাং ঝংকার শুনতে।

এমনকি কলিয়াকেও পছন্দ করে, কখনো আবার ঘেন্নাও করে। সে খুব শান্তশিষ্ট ছেলে, কখনো টাইগারকে হাড়ের টুকরো দিতে ভুলে যায় না। তানিয়ার মনে হয়, একই স্কুলে পড়াশোনা, একসাথে খাবার খাওয়া, খেলাধুলা করলেও, তাদের মধ্যে বোঝাপড়া নেই। যতখানি সে কলিয়াকে নিয়ে ভাবে, কলিয়া তাকে নিয়ে একমুহূর্তও ভাবে না।

তাহলে কেন সে যেতে রাজি হলো একসাথে মাছ ধরার জন্য, আর কেনই-বা তাকে সেই জায়গাটা চিনিয়ে দিলো যেখানে ব্রিম মাছ ঘাই মারে?

****

আট

তানিয়া তারা দেখতে ভালোবাসে। শুকতারা। সন্ধ্যাতারা। গ্রীষ্মের আকাশে নেমে আসা বড়বড় তারা।

সুদূরের ছোটছোট নিযুত তারা যখন মিটমিট করে জ্বলেশরতের অপার আকাশে।

মাছ ধরার জন্য তানিয়া আর ফিল্কা ঘুমন্ত শহর ছাড়িয়ে নদীর কাছে বসে। তখন আকাশের মতোই নদীর কালো আর শান্ত জলে জ্বলজ্বল করে তারা। হাতে অঢেল সময় নিয়ে নদীতীরে বসে ছিপ ফেলা আর সুতোয় কখন টান পড়ে তার অপেক্ষা করা, এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?

ভোর হতে এখনো ঢের সময় বাকি। নবারুণ আলো যখন নদী ঢাকা কুয়াশাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়, জলের ঢেউ ছুঁয়েকুয়াশা তখন ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে, আর গাছগাছালির মাঝ দিয়ে পালাতে যেয়ে গোত্তা খায়।

এসময় কল্পনাবিলাসী মন ডানা মেলে। কাঠবিড়ালী এত ভোরে কী করে? আচ্ছা, ডেয়ো পিঁপড়েরা কি এখনো ঘুমুচ্ছে নাকি শীতে জবুথবু হয়ে আছে?

রাত মরে যায়। কিন্তু যাওয়ার আগে তার সমস্ত সৌন্দর্য যেন উজাড় করে দেয়।

তানিয়ার ঘুম ভেঙেছে। দিগন্ত বলয়ের কাছে এখনো কিছু তারা মিটমিট করে জ্বলছে আর মিলিয়ে গেছে বাকি তারা।

‘মাছ ধরার জন্য আজকের দিনটা ভালো যাবে না মনে হচ্ছে,’ ভাবল তানিয়া। ‘কলিয়া আসবে আমাদের সাথে, ওর জন্যই না অশুভ হয়ে যায়!’

কেউ একজন জানালায় বার-দুই টোকা দিলো। আলো না জ্বালিয়ে চটপট করে পোশাক পরে নিল তানিয়া। এক ধাক্কায় জানালা খুলে লাফিয়ে পড়ল বাগানে।

ফিল্কা দাঁড়িয়ে আছে। তার কাঁধে মাছ ধরার ছিপ আর আলো-আঁধারির মাঝে মনে হচ্ছিল ভীষণ অস্থির হয়ে আছে।

‘দেরি করলে কেন?’ তানিয়া জিজ্ঞেস করল। ‘রাতে কেঁচো খুঁড়ে পেয়েছ?’

‘এই শহরে খুঁড়ব কোথায়?’ ভাঙা ভাঙা গলায় উত্তর দিলো ফিল্কা। ‘আর দেরি-বা কোথায় হলো? আমাদের হাতে বহুত সময় আছে।’

‘আমি জানি কেঁচো খুঁড়ে পাওয়া কঠিন,’ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল তানিয়া। ‘তা আমার ছিপ বড়শি এনেছ?’

‘হু।’

‘বাহ, তাহলে চলো যাই, আর দাঁড়িয়ে থাকা কেন?’

‘কলিয়া আসবে না?’ ফিল্কা জিজ্ঞেস করল।

‘ওহ, হ্যাঁ, কলিয়া!’ তানিয়া এমনভাবে ভ্রুকুঁচকাল যেন কলিয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল, আদতে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই মনে আছে তার।

‘ওর জন্য আমরা জাহাজঘাটার পাশে অপেক্ষা করব,’ তানিয়া এই বলে শিস দিয়ে ডাকল টাইগারকে।

কুকুরটি বারান্দায় শুয়ে ছিল। এটা তার প্রিয় কায়েমি জায়গা। নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না তার। শুধু তানিয়ার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল, যেন কথা বলছে, ‘উঁহু, আমায় আর ডেকো না বাপু। তোমার সাথে কোথায় না গিয়েছি? গরমের দিনে মাছ শিকারে, শীতের সময়ে স্কেটিং-এ,এমনকি তোমার স্কেটসও বয়েছি। কিন্তু এখন আমার সেইদিন নেই। আমি বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি রে, এই অকালে বের হতে ইচ্ছে হচ্ছে না।’

তানিয়া তার নিঃশব্দে বলা কথাগুলো বুঝতে পারল।

‘তথাস্তু,’ সে বলল। ‘তুমি যদি না চাও তবে তোমাকে আমার সাথে আসতে হবে না।’

কিন্তু কসাক তো তাদের সাথে যেতে পারে!

‘কসাক,’ সে ডাকল।

বিড়ালটি তার ছানাপোনাসহ ওদের পিছুপিছু বেরুল।

‘ওদের নেওয়ার কী দরকার?’

‘কিছু মনে করো না, ফিল্কা,’ বলল তানিয়া। ‘নদীতীরে আমরা কেন যাচ্ছি তা তুমি-আমি যেমন জানি, ওরাও তেমনই জানে।’

আকাশপটে আঁধার মিলিয়ে কখন যে ঊষার প্রথম ছোঁয়া লেগেছে, টের পায়নি তারা। পা বাড়াতেই মনে হলো তারা কোনো মায়াদ্বীপে এসে পড়েছে। চারপাশের গাছপালা কুয়াশা জড়ানো, মনে হচ্ছে মুহূর্তেই ধোঁয়ার মতো উবে যাবে আর শহরের চিমনিগুলোর ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে রূপ নেয় অলৌকিক বনানীর।

রাস্তার ঢালের শুরুতে তারা কলিয়ার জন্য দাঁড়িয়ে রইল।

দেরি করছে কলিয়া। এই ফাঁকে ফিল্কা তার দুহাত মুখের কাছে নিয়ে ফুঁ দিয়ে গরম রাখার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ আগে হিমশীতল মাটি খুঁড়ে কেঁচো বের করেছিল সে।

তানিয়া অপেক্ষা করার মাঝের নীরবতাটুকুকে উপভোগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার নিরাবরণ কেশ কুঞ্চিত হয়ে আসে আর তুহিন কুয়াশায় সে কেঁপে কেঁপে ওঠে। তার সমস্ত অন্তরাত্মা এই কথাই প্রকাশ করতে চায় :‘দেখো, দেখো, এই হলো কলিয়া।’

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে কলিয়া লঘু পায়ে হেঁটে আসে।

তানিয়ার কাছে পৌঁছে মাটিতে বারকয়েক পদাঘাত করে ছিপ কাঁধে তুলতে তুলতে বলল কলিয়া, ‘দেরি হয়ে গেল, দুঃখিত। গতরাতে ঝেনিয়া ওদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিল। ওদের বাড়িতে একটা জলের চৌবাচ্চা রয়েছে, আর তাতে কত রং-বেরঙের মাছ আছে! তোমরা ভাবতে পারবে না। কয়েকটা মাছ কী সুন্দর!একটা মাছের গায়ের রং সোনালি, লেজটা কালো আর লম্বা। মনে হচ্ছিল মাছটা স্কার্ট পরে আছে। আমি চোখ সরাতে পারছিলাম না...কিন্তু দুঃখিত আসলে, দেরি হয়ে গেল।’

তানিয়া রাগে ফুঁসে উঠছিল।

'আমি দুঃখিত, আমি দুঃখিত,' কলিয়াকে ব্যঙ্গ করে তার কথার পুনরাবৃত্তি করল সে। 'এয়েছেন বিনয়ের অবতার! আমাদের এতক্ষণ অপেক্ষা করালে কেন? মাছ ধরার ভালো সময়টা তুমি নষ্ট করে দিলে।'

কলিয়ার মুখে রা নেই।

'আমাদের সময় শেষ হয়ে যায়নি। এখনো প্রচুর সময় আছে। যদিও আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু নদীর চারপাশে এখনো অন্ধকার। তুমি ঢেউও দেখতে পাবে না,' সবজান্তার মতো বলল ফিল্কা। 'তুমি রেগে গেলে কেন, তানিয়া?'

'কারণ, অতিরিক্ত ভদ্র মানুষদের আমি ঘৃণা করি,' তানিয়া কাটাকাটা জবাব দিলো। 'আমার সবসময়ই মনে হয় তারা আমার কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো কিছু কেড়ে নিতে চায়।'

'আমি বিড়াল ঘৃণা করি,' ফিল্কার দিকে তাকিয়ে বলল কলিয়া। 'সব বিড়াল, যেসব বিড়াল মাছ ধরার সময়ে যায় আর যেসব বিড়াল যায় না। কিন্তু এজন্য তো ঝোঁকের মাথায় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।'

ফিল্কা ঝগড়া সহ্য করতে পারে না। সে দুঃখী দুঃখী মুখে দাঁড়িয়ে রইল। 'তুমি কেন ওর পিছনে পড়ে থাক? ক্লাসেও, এখানেও,' ফিল্কা বলল। 'আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। যে শিকারের আগে ঝগড়া করে, তার বাড়িতে থাকা উত্তম।একথা আমার বাবা বলেন। তিনি ঠিকই বলেন।'

কলিয়া কাঁধ ঝাঁকাল।

'আমি বুঝতে পারছি না কেন আমরা ঝগড়া করছি। আমি তো চাই না এটা। সে এসব শুরু করেছে। আর বাবা বলে দিয়েছেন যেন আমরা সবসময় বন্ধু হয়ে থাকি।'

'তিনি কি বলেছেন এতে আমার কিছু আসে যায় না,' জেদের সাথে বলল তানিয়া।

ফিল্কা করুণ মুখ করে তাকিয়ে রইল তানিয়ার দিকে। কলিয়াও বেদনাহত হলো, কিন্তু তার মুখের ভাব দেখে কিছু বোঝা গেল না।

'অবশ্যই আসে যায়,' ফিল্কা প্রতিবাদ করে উঠল। 'আমার বাবা একজন শিকারী। তিনি বেশি কথা বলেন না। কিন্তু যতটুকু বলেন, সত্য বলেন।'

'এই তো,' কলিয়া সহাস্যে বলে উঠল। 'এমনকি তোমার বিশ্বস্ত সানচো পানসাও তোমার সাথে একমত নয়।'

'তুমি ওকে সানচো পানসা ডাকলে কেন?' ঠোঁটের কোণে অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল তানিয়ার। 'কারণ তুমি মনে হয় সারাজীবনে শুধু দন কিহোতে পড়েছ।'

'উঁহু, আমি দন কিহোতে অনেক আগেই পড়েছি,' কলিয়া শান্তস্বরে উত্তর দিলো। 'আমি ওকে এটা বলেছি, কারণ ও সবসময় তোমার ছিপ টানে আর তোমার জন্য কেঁচো খুঁড়ে।'

'সে তোমার থেকে হাজার গুণ ভালো ছেলে। তাই সে করে,' রাগে আরক্তিম হয়ে উঠল তানিয়ার মুখ। 'ফিল্কা, তুমি ওকে কোনো কেঁচো দেবে না।'

'হায় ঈশ্বর!' ফিল্কা ভাবল। 'ওরা এমনভাবে কথা বলছে যেন আমি মারা গেছি।'

কলিয়া আবারও কাঁধ ঝাঁকাল।

'কুছ পরোয়া নেহি,আমি নিজের জন্য কেঁচো খুঁড়ব। তোমাদের ঐ বাসি কেঁচোর দরকার নেই। আর আমি নিজেই মাছ ধরার ভালো জায়গা খুঁজে নেব।'

সে তৎক্ষণাৎ ঢাল বেয়ে নেমে গেল। পাথরের চাই আর ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। দূর থেকে শুধু তার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আর তা মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

তানিয়া রাস্তার ঢালের দিকে তাকিয়ে রইল বহুক্ষণ।

নদীর বুকে দুধের সরের মতো কুয়াশা নামে আর তা বালুচর ছুঁয়ে ধীরে ধীরে দূর্বাদল, তিরতির করে কাঁপা চিরল পাতা আর সবকিছু গ্রাস করে নেয়। তার মনোভূমিও যেন ঢেকে যায় সর্বগ্রাসী কুয়াশায়।

ফিল্কা নির্বাক হয়ে লক্ষ করে। বুঝে উঠতে পারে না কী বলবে।

'কী হয়েছে তোমার?' অবশেষে মুখে যেন কথা ফোটে ফিল্কার। 'কেন সবসময় কলিয়ার পিছনে পড়ে থাক?আমি তো ক্লাসে ওর পাশে বসি, ওর কোনোকিছুই খারাপ দেখি না। আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী ছেলে ও, এমনকি তোমার থেকেও।সে কারও বিষয়ে নাক গলায় না। জার্মান ভাষার শিক্ষকের সাথে ওকে জার্মান ভাষায় কথা বলতে দেখেছি। সে ফরাসি ভাষাও জানে। কিন্তু ও তো কারও কাছে এসব বলে বেড়ায় না। তবে কেন তুমি ওর পিছনে পড়ে থাক?'

তানিয়া উত্তর দেয় না। সে এগিয়ে যায় নদীর দিকে। সকালবেলার আলসে নদী কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

তানিয়ার পিছুপিছু কসাক তার ছানাপোনা নিয়ে গুটিগুটি পায়ে ঢাল বেয়ে নামে।

ফিল্কা অগত্যা তাদের অনুসরণ করে। সে ভাবে কলিয়া কত অদ্ভুত একটা ছেলে! তানিয়ার সাথে মাছ শিকারে হাজার কি লক্ষ লক্ষ বিড়াল আসলেও তো অসুবিধা নাই তার। তানিয়া পাশে আছে, তাতেই তার আনন্দ।

আর তানিয়াও বলিহারি! কলিয়া যখন তাকে সানচো কি পানসা বা এরকম কিছু ডেকেছিল, তাতে অত রাগ দেখানোর কী আছে! ঐ দুইজনের নামে সে তো খারাপ কিছু শোনেনি। আর তাছাড়া তাকে কে কী বলে ডাকল তাতে তো তার কিছু আসে যায় না।

তারা ঢাল বেয়ে নামে নদীতীরে। কাঠের পাটাতন দিয়ে গড়া খেয়াঘাটে কিছু মাছ ধরার নৌকা ভিড়ানো আর সেখানেই বসে আছে কলিয়া। মাছ ধরার সেরা জায়গাটা দখল করে বসে আছে।

'ও খুঁজে পেয়েছে, অবশেষে!' ফিল্কা যেন নিজেই নিজেকে শোনাল। ওর কণ্ঠে অকৃত্রিম আনন্দ টের পাওয়া যায়।

সে কলিয়ার কাছে যেয়ে তার বোতলে উঁকি দিলো। বোতলটির তলানিতে কেঁচোহীন একমুঠো কাদামাটি রয়েছে। তানিয়ার অগোচরে কয়েকটা কেঁচো কলিয়ার বোতলে রেখে দিলো।

কিন্তু তানিয়া এসব দেখেও যেন দেখল না। বলল না কিছু। তানিয়া ছিপ আর কেঁচো নিয়ে কলিয়ার কাছাকাছি পাটাতনে বসে পড়ল। একটা ভালো জায়গা দেখে ফিল্কা ওদের থেকে আরও দূরে সরে বসল। মাছ ধরার সময়ে সে একা থাকতে পছন্দ করে।

মিনিটখানেকের জন্য জলের ওপর থেকে দৃষ্টি সরে না তাদের। এমনকি বিড়ালছানারাও বড়বড় চোখে তাকিয়ে রইল। কী একটা জাদু আছে জলের গভীরে!যেন সারারাত জলবন্দি থেকে এই সাতসকালে মুক্তি পেল কুয়াশা। আর মুক্তির কী আনন্দ! জলের ওপর ধেইধেই করে নাচতে নাচতে ওপরে উঠছে আর ওপরে উঠছে। সূয্যিমামাকে আবার ছুঁয়ে ফেলবে নাকি! বোকা কুয়াশা আকাশ জুড়ে দোল খায়। ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসছে কুয়াশা। জলও পরিষ্কার হয়ে আসছে। তীরের কাছে মাছেরা পাগলের মতো ঘাই মারছে। তানিয়া এমনটা আগে কখনো দেখেনি।

মাছেরা কিন্তু বেশ রগুড়ে। নিজের ছিপ থেকে চোখ সরে গেছে কি, অমনি ওরা তোমাকে বুদ্ধু বানাবে।

তানিয়া কলিয়ার ছিপের দিকে আর কলিয়া তানিয়ার ছিপের দিকে তাকিয়ে আছে এই ভয়ে যদি কে কার আগে মাছ ধরে ফেলে। ইতোমধ্যে মাছেরা টোপ গিলে বরশি ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।

কলিয়া মাছের আশা ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল। মুখের কাছে হাত তুলে বড়বড় হাই তুলতে লাগল।

'আমি জানতাম কোনো মাছ পাওয়া যাবে না,'কারও দিকে না তাকিয়ে সে জোরে জোরে বলল। 'জলের দিকে তাকিয়ে থাকা বিরক্তিকর বিষয়। ঘুম পায় শুধু। তার চেয়ে বরং এসব মূর্খ মাছকে চৌবাচ্চায় রেখে দিলেইহয়। ঝেনিয়া যেমনটি করে।'

'হু, এরা মূর্খ তো, তাই না?' তানিয়া শ্লেষাত্মক স্বরে বলল। 'এরা যদি মূর্খ না হতো, তাহলে তো এরা কাচের চৌবাচ্চায় জল খেতে যেত না!'

কলিয়া বুঝে উঠতে পারল না কী বলবে। ছিপ রেখে উঠে পড়ে সে পাটাতনের ঘাটে। কসাক কাছেই থাবা দিয়ে ছোটছোট মাছ ধরছিল। কলিয়া হেঁটে যাওয়ার সময় বিড়ালটি সরে গেল একপাশে। আর বিড়ালছানা ঈগল এত মুগ্ধ হয়ে মাছ দেখছিল, হঠাৎ একটা মাছ তার নাক বরাবর জল থেকে লাফিয়ে উঠল। তাই আচমকা চমকে উঠেতাল সামলাতে পারল না ঈগল, একেবারে জলে ঝপাৎ।

হঠাৎ শব্দ শুনে তানিয়া তাকাতেই দেখল বিড়ালছানা জলের ঢেউয়ে ঘাটের অন্যপাশে চলে গেছে। কসাক ঘাট থেকে দৌড়ে চলে আসল তীরের বালুচরে আর গরগর করতে লাগল। তানিয়া পাটাতনে হাতের তালুতে ভর দিয়ে লাফ দিলো জলে। সে জলের স্রোত ঠেলে ঠেলে চলল। তার কাপড়ের ঘের জলে ভেসে যেন বুনোফুলের পাপড়ি। কসাক জলের কাছে এসে দাঁড়ায় আর কলিয়া যেখানে ছিল, সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

তানিয়া হাত বাড়িয়ে তুলে ধরল বিড়ালছানাকে। পশম ভিজে জবজবে হয়ে গায়ের সাথে লেপটে আছে আর তাই তাকে আরও ছোট্ট লাগছে যেন ঠিক ইঁদুরছানা।

তানিয়া পাথরের চাঁইয়ের ওপরে ঈগলকে রাখতেই কসাক ছানার সারা গা চাটতে লাগল।

কলিয়া নড়েনি।

'তুমি একে ইচ্ছে করে পানিতে ফেলেছ। আমি দেখেছি,' তানিয়া রাগে ফেটে পড়ল। প্রত্যুত্তরে কিছুই বলেনি কলিয়া।

'ভীতু ছেলে একটা,' তানিয়া মনে মনে বলল। কলিয়ার বিহ্বল অবস্থা কাটানোর জন্য সে মাটিতে বার দুই পদাঘাত করল। কিন্তু তার অকারণ রাগে ছেলেটা কোনো কথাই বলতে পারেনি।

তানিয়া ছুটল। ছুটতে যেয়ে তার ভিজা স্কার্ট হাঁটুতে জড়িয়ে যাচ্ছিল। খাড়াই-এর চূড়ায় পৌঁছে সে হাঁফাতে লাগল। কলিয়াও তার পিছুপিছু ছুটে এসে জেলেদের কুঁড়েঘরের কাছে দাঁড়াল। দম বন্ধ করে হাত ধরল তানিয়ার।

'তানিয়া, বিশ্বাস করো আমায়। আমি কিচ্ছুটি করিনি।'দম না নিয়ে বলে চলল, 'এটা একটা দুর্ঘটনা।'

'হাত ছাড়ো আমার!' রুদ্ধশ্বাসে বলল তানিয়া। 'যথেষ্ট হয়েছে, বাড়ি যাব আমি।'

'তাহলে আমিও তোমার সাথে যাব।'

সে তার হাত ছেড়ে দিয়ে তাকে অনুসরণ করে চলল। 'কোন সাহসে তুমি আমার সাথে আসছ!' তানিয়া প্রায় চিৎকার করে উঠল।

সে জেলেদের কুঁড়েঘর ছাড়িয়ে শৈল পাহাড়ের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ল।

‘কিন্তু তুমি তো আজ ডিনারে আসছ?’ কলিয়া জিজ্ঞেস করল। ‘আজ রবিবার। বাবা তোমার জন্য অপেক্ষা করবেন। তুমি যদি না আস, বাবা ভাববেন আমি তোমার সাথে ঝগড়া করেছি।’

‘ও আচ্ছা! এই ভয় পাচ্ছ তুমি?’ শৈল পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে বলল তানিয়া।

‘না, তুমি বুঝতে পারছ না। আমি বাবাকে ভালোবাসি আর আমি আমার বাবার মনে আঘাত দিতে চাই না। চাই না তুমিও আঘাত দাও।’

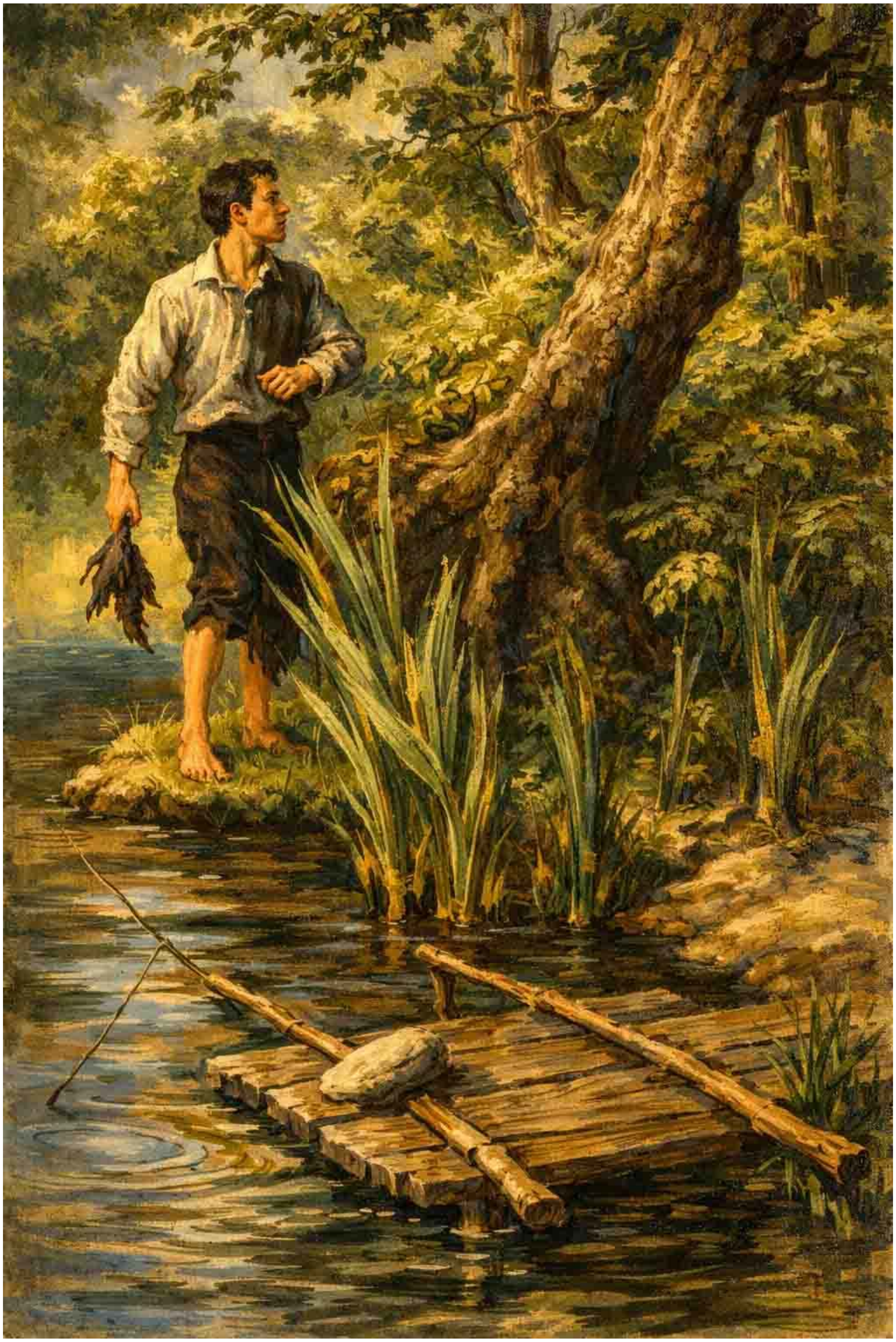
‘যথেষ্ট হয়েছে, আর না। আমি সব ভালোভাবে বুঝতে পারছি। আমি আজকের ডিনারে আসছি না। আর কখনো আসব না তোমাদের বাড়িতে।’

সে দ্রুত পায়ে হেঁটে কুঁড়েঘরের আড়ালে হারিয়ে গেল।

কলিয়া পাথরের চাঁইয়ের ওপরে বসে পড়ল। রোদঢালা সকালে তপ্ত হয়ে উঠেছে পাথরটা, শুধুমাত্র একটা পাশ তানিয়ার ভিজে স্কার্টের ছোঁয়া লেগে কালচে আর ঠান্ডা হয়ে আছে।

কলিয়া আলতো করে স্পর্শ করল পাথরের এই পাশটা।

‘ভারি অদ্ভুত মেয়ে তানিয়া!’ সে মনে মনে বলল। ‘ও ভেবেছে আমি ভীতু ছেলে। বড্ড অদ্ভুত ও!’ বিড়বিড় করল সে। ‘ও কতকিছু করবে আর কতকিছু বলবে। ওর কথায় অবাক হয়ে লাভ নেই।’



ফিল্কা এসবের কিছুই দেখেনি। সে মাছ ধরা নিয়ে ব্যস্ত। সে অনেকগুলো কালো চোখের চ্যাপ্টা মাছ পেয়েছে। সবচেয়ে বড় মাছটা হলো বড় মাথার কার্প মাছ। সে এটাকে বালুচরে একপ্রকার টেনে এনে পাথর দিয়ে থেঁতলে মেরেছে। এরপর সে ভেবেছে যথেষ্ট হয়েছে মাছ শিকারের। বিশ্রাম নেওয়া যাক একটু। পাটাতনের দিকে ঘুরতেই দুটো ছিপ পড়ে থাকতে দেখে। আর কেউ নেই সেখানে, না তানিয়া, না কলিয়া। পাথুরে খাড়াই পথটাও জনশূন্য।

ফিল্কা দূরে পাহাড়ের দিকে তাকায়। শনশন করে বইছে বাতাস। কোথাও কোনো মেঘ নেই।

একটা ভিজে বিড়াল ছানাপোনা নিয়ে ধীরে ধীরে খাড়াই পথটা বেয়ে উঠছে।

****

নয়

এতসবের পরেও তানিয়া তার বাবার বাড়িতে এলো। বারান্দা পার হয়ে কাচের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে সে। আগের মতো টাইগারকে বারান্দায় রেখে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দেয়।

যখন খুশি তখন এখানে আসা তার অধিকারের মধ্যে পড়ে। এটা তার বাবার বাড়ি। সে তাকে দেখতেই আসে, এছাড়া অন্য কিছু নয়। যদি কেউ ভেবে থাকে সে চেরি পাইয়ের লোভে এখানে আসে, তবে সে বিরাট ভুল করবে।

এবার দ্বিতীয়বারের মতো সে এ বাড়িতে এলো। কাচের দরজাটা ঝনঝন শব্দে কিছুটা আপত্তি জানায়। আড়ষ্ট দরজায় ঝনঝনানি শব্দ যেন আর থামতে চায় না। ঘরের সবাই খাবার টেবিলে বসা আর তাদের প্রত্যেকের সামনে রাখা হয়েছে বড় এক বাটি করেপেলমেনি*।

(টীকা : মাংসের পুর দেওয়া একপ্রকার পুলি বিশেষ)

‘তানিয়া, তুমি চলে এসেছ!’ তার বাবা আনন্দে আত্মহারা হলেন। ‘বাহ! চমৎকার! কলিয়া বলেছিল তুমি নাকি আসবে না। তুমি যে সিদ্ধান্ত বদলে চলে এসেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি। এসো, এবার পেলমেনির সদগতিতে নেমে পড়ি। নাদিয়া বেশ পেলমেনি বানিয়েছে। ওর রান্নার কাজে কিন্তু কলিয়াও হাত লাগিয়েছে। একেবারে লাজওয়াব! খেয়ে দেখো।’

‘আসলেই!’ তানিয়া ভাবল। ‘সে পেলমেনি বানাতে জানে!’

সে টেবিলে বসে পড়ল। তার চোখজোড়া ঘুরে ঘুরে তার বাবাকে দেখে, চারপাশের সফেদ দেয়াল দেখে, আর দেখে নাদিয়াকে। নাদিয়া বন্ধুত্বপূর্ণ হাতে রুটি আর পেলমেনির বাটি তার দিকে এগিয়ে দেয়।

কিন্তু যতটা পারে সে এড়িয়ে গেল কলিয়ার দৃষ্টি। কলিয়া কুঁজোপানা হয়ে চেয়ারে বসে আছে, তার মাথা যেন ডুব দিয়েছে তার দুই কাঁধের মাঝে। শুধু একটা হালকা হাসি ঝুলে আছে তার ঠোঁটের কোণে।

‘বাবা, তুমি ওকে কেন বললে যে পেলমেনি বানাতে আমিও সাহায্য করেছি?’ কলিয়া জিজ্ঞেস করল। ‘সে এখন এগুলো খাবে না।’

‘কেন? কী হয়েছে? তোমরা কী ঝগড়াঝাটি করেছ?’ তার বাবার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে।

‘ওহ, না, বাবা। আমরা ঝগড়া করিনি,’ কলিয়া উত্তর দিলো। ‘তুমি কি বলোনি যাতে আমরা বন্ধুর মতো থাকি?’

‘বেশ! বেশ!’ কলিয়ার উত্তরে তার বাবা স্বস্তি পেলেন।

কলিয়া টেবিলের ওপরে ঝুঁকে তানিয়ার কানে ফিসফিস করে বলল, ‘তাহলে কে আমায় বলল, “আমি ডিনারে আসব না”?’

‘আমি তো ডিনারে আসিনি,’ তানিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল। ‘আমি ক্ষুধার্ত নই। না, না, আমার একটু ক্ষিধেও লাগেনি,’ সে বারবার বলল তার বাবা আর বাবার স্ত্রীকে।

‘তোমার ক্ষুধা লাগেনি?’ তার বাবা দ্বিধা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। ‘আর কোনো পেলমেনি চাই না?’

‘না, ধন্যবাদ। আমি মায়ের সাথে রাতের খাবার খেয়ে এসেছি।’

‘তোমাকে আর তৃতীয়বারের মতো ওকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, বাবা,’ কলিয়া উপহাসের সুরে বলল। ‘ও আর কোনোক্রমেই খাবে না।’

‘আচ্ছা, ও যদি খেতে না চায়, তো খাবে না। জোরাজুড়ির তো কিছু নেই,’ আক্ষেপ নিয়ে তার বাবা বললেন। ‘আমি দুঃখিত। তবে পেলমেনিগুলো বেশ মজার ছিল!’

আসলেই পেলমেনিগুলো খেতে দারুণ লাগে! কিন্তু বাবা আর নাদিয়া দুজনেই বোকা। তারা পেলমেনি ভিনেগারে চুবিয়ে খাচ্ছে।

কী অদ্ভুত! তাই না?

তারা কি জানে না পেলমেনি শুধু দুধ দিয়ে খেতে হয়!

পেলমেনি দুধে ভিজিয়ে তার ওপরে গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দাও, এরপরে একটা একটা করে সাবাড় করো। আহা! অমৃত একেবারে!

তানিয়ার মাথায় চিন্তার লহরী বইছে অথচ চোখজোড়া আটকে আছে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া পেলমেনির বাটির ওপর। তার মাথা কিছুটা ঝিমঝিম করছে, কারণ তার আসলে রাতে কিছুই খাওয়া হয়নি। আসলে সে জানে না কী চায় সে। একজন অন্ধের মতো সে এ বাড়িতে এসেছে। এসেছে একজন বধিরের মতো যে শুধু নিজের হৃদস্পন্দনের ধুকপুকানি শুনেছে। সত্যি বলতে তানিয়া তার অন্তরের কথার মূল্য দিয়েছে। তাই সে এসেছে কিছু না ভেবে, কিছু না বুঝে। এসে নিদেনপক্ষে কিছুটা তর্কও করতে পারত, তাতে হয়তো মানসিক শান্তি পেত সে।

‘বাবা, হেরিং মাছ নাকি জন্ম থেকেই নোনা? সত্যি?’ তানিয়া জিজ্ঞেস করল। ‘কলিয়া বলেছে নোনা।ও বলে জীববিজ্ঞান সব গালগপ্পে ভরা। এটা কোনো বিজ্ঞানই নয়,’ সে বলল।

‘আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী বলতে চাইছ?’ তার বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

কলিয়া খাওয়া বন্ধ করে দিলো। হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছে তাকিয়ে রইল তানিয়ার দিকে যেন ভ্যাবাচাকা খেয়েছে।

সে এধরনের কোনো কথাই বলেনি। কিন্তু তার চমকে যাওয়ার দশা পার হলো যখন মনে পড়ল, সে প্রতিজ্ঞা করেছে ওর কোনো কথায় বা কাজে চমকাবে না।

সে স্থির দৃষ্টিতে তানিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। সে চোখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

‘আলবৎ, এটা কোনো বিজ্ঞানই নয়,’ সে বলল। ‘এটা কী করে বিজ্ঞান হয় যদি বলে লেজওয়ালা চার ফুট লম্বা জানোয়ারই বিড়াল!’

তানিয়া রাঙা হয়ে উঠল। সে জানে কলিয়া কী ইঙ্গিত দিচ্ছে।

‘তোমার প্রিয় বিষয় কী, কলিয়া?’

‘গণিত, যদি দুটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে…। আমি সাহিত্যও ভালোবাসি। এখানে একটা অমায়িক আর অকৃত্রিম ব্যাপার আছে।’

‘অমায়িক?’ তানিয়া ওর কথার পুনরাবৃত্তি করল।

‘যদিও তানিয়ার শিল্প-সাহিত্যে ঝোঁক আছে, ডিকেন্স আর ওয়াল্টার স্কট ভালো লাগে, এমনকি ক্রিলোভ, গোগলও পছন্দের, তানিয়া বলে উঠল, ‘আমি এমনটা ভাবি না।“একদিন সকালে এক গাধা দেখতে পেল এক নাইটিঙ্গেলকে।” কেন?কারণ, এটা ছ্যাবলামি।’

কেউ কারও কৌতুকে না হেসে এভাবেই চলতে লাগল যতক্ষণ-না তার বাবা এসব না বুঝে বলে উঠলেন, ‘থামো তো, কীসব আবোলতাবোল বকছ তোমরা!’

তানিয়ার মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে আর কানে যেন বেজে চলছে হাতুড়িপেটার শব্দ। খিদেটা বেশ চাগাড় দিয়ে উঠেছে। ক্ষুৎপিপাসা তার হৃদয় আর মগজকে যেন কুরেকুরে খায়। স্পন্দনে স্পন্দনে টের পায় ক্ষুধার দমক। টেবিলে সাজানো খাবার যাতে দেখতে না হয়, তাই সে চোখ বন্ধ করে ফেলল। যখন সে চোখ খোলে, ততক্ষণেটেবিল পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। অবশিষ্ট পেলমেনি, রুটি আর নিমকদান–সব সরিয়ে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র তার বাটিটা বাদে। নাদিয়া তার বাটি সরাতে গেলে তানিয়া শক্ত করে ধরে রাখে বাটিটা।

‘কী হলো? বেশ অবাক হলো নাদিয়া। ‘তুমি খাবে এটা?’

‘না, না, আমি টাইগারকে কিছু পেলমেনি দিতে চাই। দিতে পারি?’

‘অবশ্যই,’ তার বাবা বললেন। ‘তুমি যদি চাও তো, পুরো বাটিটা দিতে পারো।’

আনমনে ঠান্ডা পেলমেনির বাটিতে কাটা চামচ নাড়তে নাড়তে সে বারান্দায় গিয়ে বসল। টাইগারের সামনে উবু হয়ে বসে অশ্রুসিক্ত চোখে পেলমেনি খেতে শুরু করল।

টাইগার ঘাবড়ে যেয়ে ঘেউঘেউ শুরু করল আর তাতে চাপা পড়ে গেল পায়ের আওয়াজ। কেউ এসে দাঁড়ায় তানিয়ার পিছনে।

‘আমি কাচের দরজার মাঝ দিয়ে সবকিছু দেখেছি, মা।’তানিয়ার বাবা অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। ‘কী হয়েছে? আমাকে সব খুলে বলো, সোনা মা আমার। কোনো সমস্যা হয়েছে?’

তানিয়াকে জড়িয়ে ধরে কোলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন, যেন তিনি ওর কষ্টের ওজন বুঝতে চাইছেন।

তানিয়া শান্তভাবে তাকায়। তিনি ওর কাছে গহন অরণ্যের বটবৃক্ষের মতো, যার কাণ্ড ছুঁয়ে দেখা যায়, কিন্তু এক চাউনিতে তার বিশালত্ব আন্দাজ করা যায় না।

তানিয়া তার বাবার কাঁধে মাথা রাখে।

‘বলো তানিয়া, কী তোমায় যন্ত্রণা দিচ্ছে? হয়তো, আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি। বলো প্রিয়, কীসে তোমার আনন্দ, আর কীসে তোমার কষ্ট? কী ভাবছ, মা?’

কিন্তু তানিয়া কিছুই বলল না।

'আমার মা আছে,' সে ভাবল। 'একটা বাড়ি, এমনকি একটা কুকুর আর বিড়ালও আছে, কিন্তু আমার বাবা নেই।'

কিন্তু এখন বাবার পাশে বসে একথা বলা যাবে না। তিনি কষ্ট পাবেন। অসম সাহসী, সমরভূমির রণকুশলী হয়েও ফ্যাকাশে হয়ে যাবেন মুহূর্তেই।

তানিয়া জানত না, ভাবতেও পারবে না যে তার বাবা ঘুম কিংবা জাগরণে শুধু ওর কথাই ভেবেছেন, ওর নামই নিয়েছেন।এমনকি এখনো পাশে বসে একথাই ভেবে যাচ্ছেন, 'আমার সমস্ত সুখের বিনিময়ে শুধু তোমার কল্যাণ চাই, মা আমার। আমি আমার সন্তানকে কখনো আমার বাহুডোরে আগলে রাখতে পারিনি!'

কিন্তু এ কথা তানিয়া কখনো জানতে পারবে না। একজন না-জানা মানুষের কাঁধে মাথা রেখে বসে আছে তানিয়া। কিন্তু এই পাশে বসে থাকাও কী কম আনন্দের!

হেমন্তের শেষাশেষি। বৃষ্টির ছাট আসে বারান্দায়। সান্ধ্য বাতাসে বড্ড কাঁপন লাগে।তবুও তানিয়া উষ্ণ ছিল। বাবার পাশে বসে তারাজ্বলা আকাশ দেখে, বড় চেনা যে সাঁঝের তারা। সেই তারার মিটিমিটি আলো জ্বলে রাস্তার উপরে, চুনসুরকির বাঁধানো পথে, এই কাচের দরজাওয়ালা বাড়িটার উপরে।

****

দশ

একটা গাছ কখনো কখনো মানুষের মতো হয়ে যায়।এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল স্কুলের পিছনের বাগানে। বাগানটা ছিল পোড়া কাঠের স্তূপে ভরা। ওখানে একটা গাছ আছে আর ক্লাসের জানালা দিয়ে তাকালেই একে দেখতে পাওয়া যায়। সকালবেলায় ওর দিকে তাকালে ও হেসে বলবে 'হ্যালো'। তুমিও হেসে হাত নাড়লে ও ডালপালা নাড়বে। বড্ড বোকা, তাই না?

পাতা ঝরে পড়ে যে তখন,তবুও পাতাহীন হলেও কী শোভা তার! ওর শাখায় শাখায় যেন বীণা বাজে!তার প্রসারিত ডালপালা আকাশ ছুঁতে চায় আর কালচে লাগে গাছের গুঁড়ি।

এটা এলম না কি অ্যাশ গাছ তানিয়া ঠাওর করতে পারে না। এ বছরের পয়লা তুষারপাত শুরু। গাছের শাখায় শাখায়,বাকলে পড়ছে বরফের কুচি আর পাগলের মতো এঁটে থাকতে চাইছে কিন্তু শেষ রক্ষা বুঝি হলো না, গাছের গা বেয়ে গলে গলে পড়ে বরফ–সাদা সাদা বরফ।

'ওর নিশ্চয়ই প্রাণ আছে!আমাদের সবার মতো ওরও রয়েছে উষ্ণতা,' তানিয়া ভাবল।

গাছের দিকে চেয়ে বন্ধুর মতো মাথা ঝাঁকাল সে।

ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে কলিয়াকে ডাকা হয়েছে। গোর্কির একটা গল্পের চরিত্র বিশ্লেষণ করছিল সে। আজ এটা নিয়ে আলোচনা। ওর মুখে পণ্ডিত পণ্ডিত ভাব আছে। উঁচু কপাল আর সুন্দর দুটি চোখ তার। কথায় বাজে জীবনের স্পন্দন।

আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা ওকে নিয়ে ভীষণ আহ্লাদিত। তিনি মনে মনে বললেন, 'এই ছেলে একদিন সুনাম কুড়াবে।'

'আমি একদিন গোর্কিকে নিজ চোখে দেখেছিলাম,' হঠাৎ কলিয়া বলে ফেলল। বলতে বলতেই লজ্জায় লাল হয়ে গেল সে। মনে মনে আশা করল যাতে কেউ এটাকে বড়াই হিসেবে না দেখে।

ওর মনের কথা যেন পড়তে পেরেছে বন্ধুরা।

'আমরা শুনতে চাই,' সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

'তুমি গোর্কিকে দেখেছিলে?' চোখ কপালে উঠল আলেকসান্দ্রা ইভানোভনার। 'কী সৌভাগ্য তোমার! কোথায় দেখা হয়েছিল? কথা হয়েছিল?'

'না, আমি তাকে একটা বাগানে দেখেছিলাম। ক্রিমিয়াতে। কিন্তু এখন সবটা মনে করতে পারছি না। মাত্র দশ বছর বয়সে বাবার সাথে গিয়েছিলাম।'

'গোর্কি বাগানে কী করছিলেন?'

'রাস্তার কাছে ক্যাম্পফায়ার করছিলেন।'

'এরপর কী হয়েছিল?' কিন্তু তার আর খুব বেশি মনে নেই। যতটুকু মনে পড়ে বলে চলল সে।

পাহাড়ঘেরা এক দক্ষিণের দেশের কথা যেখানে কবোষ্ণ রোদে গ্রাম্য রাস্তায় দুলকি চালে হেঁটে চলে গাধারা, ডাকে ঘ্যাঁকো ঘ্যাঁকো। সবুজ সবুজ আঙুরলতায় ছেয়ে থাকে পাথুরে বেড়া।

বাচ্চারা হা করে শুনল সব। তানিয়া এসবের কিছুই শুনল না। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। বরফ পড়ছে কম্পিত পাতাহীন গাছটায়।

'আঙুরলতা?' সে ভাবল। 'আমি তো দেওদার গাছ, ফার গাছ ছাড়া অন্য কোনো গাছ দেখিনি।'

সে মনে মনে ফুলে-ভরা আপেল গাছ, নাশপাতি গাছ আর বিস্তীর্ণ গমখেতের ছবি আঁকে।

ফুল আর ফসলের নয়নাভিরাম রূপ তার মানসপটে ভেসে বেড়ায়।

আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা তাকিয়ে আছেনতানিয়ার দিকে। তাকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছেন। তার এই প্রিয় ছাত্রীটি তাকে বেশ দুশ্চিন্তায় ফেলেছে।

'ও কী ভাবছে?কোনো ছেলের কথা না কি নাচ নিয়ে?' তিনি নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন। 'ওর স্মৃতিশক্তি তো বেশ ভালো। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসে গত পরীক্ষায় মাত্র 'বি' গ্রেড পেয়েছে।'

তিনি বলে উঠলেন, 'তানিয়া সাবানেয়েভা, তুমি আমাদের কথা শুনছ না।'

তানিয়া জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকাল, যদিও সে মনের কল্পনায় হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

'কী হলো, তানিয়া?'

'কলিয়া যা বলেছে তার কোনোকিছুই আগ্রহ জাগায় না।'

‘এটা সত্য নয়। অবশ্যই এটা আগ্রহ-জাগানিয়া বিষয়। আমরা তো বেশ আনন্দ নিয়ে শুনেছি। তুমি কি কখনো ক্রিমিয়াতে গিয়েছিলে? গোর্কিকে সামনাসামনি দেখেছিলে? শুধু একবার ভাবো, রক্তমাংসের জলজ্যান্ত গোর্কি! বইয়ের পাতার গোর্কি নয়।’

‘আমার বাবা কখনো আমাকে ক্রিমিয়াতে নিয়ে যাননি,’ তানিয়ার গলা কাঁপছে।

‘তাহলে বুঝতে পারছ, কেন কলিয়ার কথা শোনা উচিত ছিল?’

‘আমি ওর কথা শুনব না।’

‘কেন শুনবে না?’

‘কারণ তার কথার সাথে রুশ ভাষার ক্লাসের কোনো সম্পর্ক নেই।’

আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা ধীরে ধীরে জানালার কাছ থেকে সরে এসে তানিয়ার সামনে দাঁড়ালেন। তার মৃদু পায়ের আওয়াজ পুরো ক্লাসে যেন প্রতিধ্বনি তুলছে। বেশ বিমর্ষ লাগছে তাকে।

তানিয়া চুপ করে আছে।

‘তোমার বাবাকে কাল আমার সাথে দেখা করতে বলো।’

আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা সোজাসুজি চেয়ে আছেন তানিয়ার দিকে, তার মুখের দিকে, কী করে সে এমন শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ করতে পারল! এমন সময় তানিয়ার পাঁশুটে মুখ দেখে অবাক হলেন তিনি।

‘আমি মাকে বলব। তিনি আসবেন।’তানিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিলো।

শিক্ষিকা দ্বিধান্বিত হলেন। তিনি নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন, তানিয়ার কী হয়েছে কিন্তু কোনো উত্তর পেলেন না। সম্ভবত কলিয়ার সাথে কোনো ঝামেলা হয়েছে।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তানিয়ার মায়ের সাথে দেখা করে এ নিয়ে আলাপ করবেন। তিনি আলতো করে স্পর্শ করলেন তানিয়ার হাত।

‘তোমার এই খাপছাড়া আচরণের পিছনে নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে,’ তিনি বললেন। ‘এবারের মতো কিছু বললাম না। তোমার বাবা-মাকে আসতে হবে না। কিন্তু তোমার এটা অবশ্যই বোঝা উচিত, নবীন পাইওনিয়র হিসেবে এটা কোনো সভ্যভব্য আচরণ নয়। তুমি তোমার মনের কথা বলছ না। যাই হোক, তুমি তো ভালো মেয়ে। আমি সত্যি বুঝতে পারছি না কী হলো তোমার।’

বড় বিষণ্ন মনে ডেস্কে ফিরে গেলেন তিনি।

ক্লাসে কারও মুখে কোনো কথা নেই। নিশ্চল বসে আছে সবাই। একমাত্র ঝেনিয়া ঝট করে পিছনে ফিরে ফিল্কার কানে কানে বলল, ‘আসল কথা তো পিরিতি। তানিয়া নিশ্চিত কলিয়াকে ভালোবাসে।’

প্রত্যুত্তরের বদলে ঝেনিয়াকে লাথি মারল ফিল্কা।

এছাড়া আর কী-বা করত সবাই! কল্পনা শক্তিহীন বাচাল একটা মেয়ে সে।

তানিয়া এখনো ডেস্ক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। হাত কাঁপছে তার। তার মনে হচ্ছিল সে পড়ে যাবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে তার পতন রোধ করার চেষ্টা করছে।

‘দাঁড়িয়ে আছ কেন?বসো তুমি,’ আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা বললেন।

‘আমি কি অন্য ডেস্কে বসতে পারি?’

‘কেন? তোমার কি ঝেনিয়ার পাশে বসতে ভালো লাগে না?’

‘আমি তা বলিনি,’ তানিয়া বলে চলল। ‘কিন্তু এখানে বসলে জানালার বাইরে গাছের দিকে চোখ চলে যায়। মনোযোগ রাখতে পারছি না।’

‘আচ্ছা, বেশ! তুমি অন্য ডেস্কে গিয়ে বসো। তুমি বড্ড খেয়ালি মেয়ে, তানিয়া।’

তানিয়া ক্লাসের সবচেয়ে পিছনের সারির একটা ডেস্কে গিয়ে বসে পড়ল। কেউ নেই আশেপাশে।

‘তুমিও গিয়ে বসো, কলিয়া,’ শিক্ষিকা বললেন।

কিন্তু কলিয়া নড়ে না। সে কিছুটা ঝুঁকে দাঁড়ায় যেন সে ক্লাসের মেঝেতে নয়, আস্ত একটা পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাকে চড়াই বেয়ে পাথুরে রাস্তা পার হতে হবে।

‘কলিয়া, যাও। বসে পড়ো। আমি তোমাকে “এ” গ্রেড দিলাম।’

‘আমি কি তানিয়া সাবানেয়েভার ডেস্কে বসতে পারি?’

‘তোমাদের দুইজনের কী হয়েছে?’

কিন্তু তিনি ওর ইচ্ছেমতো জায়গায় বসতে দিলেন। নিছক জেদের বশে সে ঝেনিয়ার পাশে বসল।

তানিয়া একা বসে আছে আর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল এই আশায় যাতে এখান থেকে গাছটি দেখা না যায়। কিন্তু পালিয়ে লাভ হয়নি।এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে গাছটি। বরফ আর গলছে না। গাছটির মস্ত ডালগুলোতে জড়িয়ে ধরেছে তুলার মতো বড়বড় বরফ। জানালার শার্সিতে কুয়াশার আবছায়া পড়ে আর সবকিছু যেন হারিয়ে যায় নিমিষেই।

****

এগারো

‘মনভুলো মানুষ সহজেই পথ হারায়,’ ফিল্কা ভাবে।

নির্জন রাস্তা। বিকেলের নরম রোদে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে চারপাশ। রাস্তার মোড়ে চীনা ফেরিওয়ালা পিঠেপুলির পসার সাজিয়ে বসেছে আর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তানিয়ার অপেক্ষায় বসে আছে ফিল্কা। ওরা প্রতিদিনই একসাথে বাড়ি

ফেরে, কিন্তু বাহারি পিঠের সমাহার আর ফেরিওয়ালার অদ্ভুত খড়মজোড়া আজ খেয়ালি করে ফিস্কাকে। তানিয়া গটগট করে কখন যে চলে গেছে, টের পায়নি ফিস্কা। তাই শূন্যদৃষ্টি মেলে আকাশ-পাতাল ভেবে চলছে ফিস্কা।

তাইগায় এমনটা হলে ফিস্কা আর অন্য কিছু ভাবত না, মাটিতে তানিয়ার পায়ের ছাপ খুঁজে খুঁজে ঠিকই তাকে ধরে ফেলত। কিন্তু এই জনারণ্য শহরে এমন করে খুঁজলে হাসির পাত্র হবে সে, আর সাথে একটা বিদঘুটে ডাকনাম জুটে যাবে তার। যদি সবাই তাকে 'হাউন্ড' বলে ডাকে? কী লজ্জা-না পাবে তখন! দীর্ঘক্ষণ ভেবে ভেবে সে একটা নির্মম সত্যের মুখোমুখি হয়, আর তা হলো তার এইসব জারিজুরি বিদ্যা শহরবাসীর কাছে মূল্যহীন।

সে জানে বনে কী করে মেরু-নকুলের খোঁজ পেতে হয়; জানে গোলাঘরে শস্যদানা যদি বরফে জমে যায় তখন কুকুরেটানা স্লেজে চড়ার মোক্ষম সময়, কারণ স্কেটিং করার এইসময়ে ফাটল ধরবে না রিঙ্কে; এ-ও জানে ভরা জ্যোৎস্নায় যদি চর্নি অন্তরীপ হয়ে ঝোড়ো বাতাস বয়, তবে তুষারঝড় শুরু হওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার।

কিন্তু এই শহরে কেউ চাঁদ দেখে না। খবরের কাগজে আবহাওয়া সংবাদ দেখে সবাই স্কেটিং করতে যায়, আর ঝড়ের পূর্বাভাস পায় বুরুজে নিশানের সংকেতে অথবা বন্দুকের গুলির শব্দে।

ফিস্কার এই শহুরে জীবন অন্যান্য ছেলেদের থেকে ভিন্নরকম কিছু নয়। বরফে পশুর পায়ের ছাপ খোঁজার শিল্প স্কুলের পাঠক্রমে নেই, কিন্তু তাকে অবশ্যই জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে, আবার বাক্যে উদ্দেশ্য, বিধেয় আলাদা করতে হবে। এই সমস্ত কাজে তো তাইগার বাঘা বাঘা শিকারীরাই ঘাবড়ে যাবে।

কিন্তু এইবার, হ্যাঁ এইবার, ফিস্কা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তার ইচ্ছেমতো সবকিছু করবে, এতে যদি কেউ হাসে তো প্রাণভরে হাসুক না! কী আসে যায় যদি তাকে ডাকে 'হাউন্ড'।

ভান করবে এসব রসিকতা সে থোড়াই কেয়ার করে।

রাস্তার মাঝে সে উবু হয়ে বসে পড়ল, আর নিরীক্ষা করতে শুরু করল প্রত্যেকটা পায়ের ছাপ।

দিনটা আজ পয়মন্ত। নির্জন রাস্তায় তাজা তাজা বরফ। পায়ের ছাপ প্রায় নেই বললেই চলে। কিছুক্ষণ পরে ফিস্কা আবার উঠে দাঁড়ায় আর দৃষ্টি খুঁজে ফেরে পায়ের ছাপ আছে কিনা! সে এখন নিশ্চিত জানে কার পায়ের ছাপ পড়েছে, মনে হয় যেন চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সে।

তানিয়ার একাকী পায়ের ছাপ বেড়ার পাশ দিয়ে চলে গেছে। বেশ অস্পষ্ট তার পায়ের ছাপ যেন তুলতুলে বরফের শোভাকে পদদলিত করতে চায়নি। তার কিছুটা দূরে পাশাপাশি দুই জোড়া পায়ের ছাপ চলে গেছে, সম্ভবত ঝেনিয়া আর কলিয়ার। ওদের পায়ের ছাপ চঞ্চল আর গাঢ়। কী অদ্ভুত ব্যবহার না করেছে ওরা! তাদের পায়ের ছাপ ঘন হয়ে এসে যেন থমকে গেছে, আর তারপরেই তানিয়ার পায়ের ছাপের কাছাকাছি চলে এসেছে।হয়তো ওরা তানিয়াকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল। তানিয়ার পায়ের ছাপ ফিস্কার বাড়ির বাগানের দিকে কিংবা নদীর বালুচরের দিকে মোড় নেয়নি। কিন্তু ঝেনিয়া আর কলিয়ার পায়ের ছাপ চলে গেছে মাছ ধরার জায়গাটার দিকে।

কিন্তু তানিয়া কোথায় উধাও হয়ে গেল? তার পায়ের ছাপ হঠাৎ করেই যেন মিলিয়ে গেছে, না কোনো বাড়ি দেখা যাচ্ছে আশেপাশে, না কোনো বাগান। সে কি পাখির মতো উড়ে যেতে পারে? নাকি ঝরাপাতার মতো উড়ে উড়ে নেচে নেচে মেঘের দেশে গেল? আর মই বেয়ে তো এতবড় বেড়া ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ফিস্কা কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে আবার চলতে শুরু করল। প্রথমদিকে কিছুদূর ঝেনিয়া আর কলিয়ার পাশাপাশি পায়ের ছাপ থাকলেও রাস্তার একটা মোড়ে এসে আলাদা হয়ে গেছে।

'ওরা ঝগড়া করছিল,' ফিস্কা অনুমান করল। নিজের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে সে পিছন ফিরে চলল যেখানে বেড়ার কাছে তানিয়ার পায়ের ছাপ ওদের থেকে আলাদা হয়েছিল।

সে বেড়ার পাশে আঙুল নির্দেশ করে মনে মনে বলল, ‘ঐ তো একটা উঁচু তাক দেখা যায় বেড়ার সাথে, তানিয়া এটায় পা ফেলে বেড়ার ওপর দিয়ে লাফ দিয়েছে। বাপ রে! কী হিম্মত মেয়েটার! কিন্তু ওর চেয়ে দ্বিগুণ জোর না থাকলে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক আমাকে জ্যান্ত কবর দেবেন।’

বেড়ার ওপর দিয়ে স্কুলব্যাগ ছুড়ে ফেলে ফিল্কা বেড়ার ওপর লাফ দিয়ে নামল। পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এক বুড়ি,আর বলে উঠলেন, ‘রে রে রে, পাজি ছোকরা!’

কিন্তু ফিল্কা না শোনার ভান করে হেঁটে চলল। ইতোমধ্যে সে অন্যলোকের সবজিখেতের মাঝ দিয়ে তানিয়ার পায়ের ছাপ খুঁজে খুঁজে চলছে। সবজিখেতের আরেক দিকের ছোট বেড়া ডিঙিয়ে তানিয়ার বাড়ির পিছনের ছোট্ট বনে ঢুকল সে।

ছোটছোট স্লো-বল ঝোপে ঝুলে আছে বেরি ফলের থোকা আর পাকা পাকা বেরি ফল টুপটাপ ঝরে পড়ে। নবীন বার্চের সারি আর বনপথ জুড়ে তাজা বরফ, সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে এক সাদার রাজ্য–অপার্থিব লাগে ফিল্কার কাছে। বনে বেড়ে উঠলেও এমন শোভা সে স্বপ্নেও দেখেনি!

বার্চের ডাল যেন কারুশিল্প। মনে হয় কেউ চকখড়ি দিয়ে এঁকেছে সাদা-কালোর আল্পনা আর কাণ্ড যেন ধোঁয়ায় জড়ানো। সূর্যের আলো ঝিলিক দেয় গাছের বাকলে বাকলে।

এই রুপালি কুঞ্জবনে তানিয়া নীরবে দাঁড়িয়ে আছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ফিল্কার পায়ের আওয়াজ তার কানে আসেনি, এমনকি তার পায়ের নিচে ঝরাপাতা মচমচ করে উঠলেও না।



ফিল্কা ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকায়, আর রাজ্যের বরফের মাঝে গুটিসুটি মেরে রইল মিনিটখানেক। এরপরে ধীরে ধীরে পিছু হটে সে বনের বাইরে চলে গেল।

'মনভুলো মানুষ সহজেই পথ হারায়,' ফিল্কা আবার নিজেকে বলল। 'কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াবে, আর বেড়ার ওপর লাফ দিয়ে পড়বে, খ্যাঁকশিয়ালের মতো ঝোপের আড়ালে ছোঁকছোঁক করবে। কিন্তু যখন কেউ কাঁদে, তখন তাকে একা রাখা উচিত।'

লম্বা এক ঘুরপথ হয়ে বন ছাড়িয়ে একটা গলি রাস্তা ধরে সে তানিয়াদের বাড়ি পৌঁছাল। গেট খুলে ভারিক্কি চালে ঘরে ঢুকল সে। তানিয়াদের বাড়ির এক বয়স্ক নার্সকে সে বুঝিয়ে বলল, সে তানিয়ার মায়ের সাথে দেখা করতে এসেছে আর তাকে এটা বলতে স্কুলের পাঠচক্রের সভার জন্য তানিয়ার আসতে খানিক দেরি হবে।

নার্স তাকে দেখিয়ে দিলো তানিয়ার মায়ের সাথে দেখা করতে কোথায় যেতে হবে। কিন্তু ফিল্কা ভেতরের ঘরের দরজা ধাক্কা দিলে এটা ক্যাচক্যাচ শব্দ করে উঠতেই বন্ধ করে দিলো। একনজরে দেখল ভেতরে বসা আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা আর তানিয়ার মা। তিনি তানিয়ার মায়ের কাঁধ জড়িয়ে ধরে বসে আছেন। মনে হচ্ছিল জরুরি কিছু বলছেন তাকে, আর বারবার তারা রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন। তারা কি কাঁদছেন?

ফিল্কা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে পিছন ফিরে বারান্দায় চলে এলো যাতে পায়ের আওয়াজ না হয়, এরপর নিঃশঙ্কোচে গেটের সামনে চলে গেল। এটা ঠিক, সে অনেক কিছুই জানে যা শহরে কোনো কাজে লাগে না। পশুর স্বরে সে জন্তু-জানোয়ারদের ডাকতে জানে, অনেক গুল্মের ঔষধি গুণাগুণ জানে, এমনকি নদীর গভীরতাও বলে দিতে পারে। সে জানে কেউ যদি বনে বাড়ি তৈরি করে, আর তাতে চিড় ধরে, তবে ফেল্ট দিয়ে চিড় মেরামত করে লাভ নেই, পাখিরা ফেল্ট ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে নিজেদের নীড় তৈরির জন্য।

কিন্তু সে জানে না সামনে বসা দুইজন মানুষ হাসাহাসির বদলে কাঁদলে কী করা উচিত? সে সিদ্ধান্ত নিল তাদের নীরবে কাঁদতে দেওয়া দরকার। তারচেয়ে বরং সে তার বাড়ির কুকুরদের কাছে গেল। ওদের আস্তানায় শীত নিবারণের ব্যবস্থা বাড়ানো দরকার।

শীত চলে এসেছে। নদী শীঘ্রই বরফে ঢেকে যাবে আর তখন চাঁদের আলোয় তামার মতো জ্বলবে।

****

বারো

বরফ পড়ছে। চারদিকে বরফ আর বরফ। শীতকালীন ছুটি শুরু হতে-না-হতেই বরফে ঢাকা পড়ে গেল গোটা শহর। অতি কষ্টেও জানালার কপাট খোলা যায় না, শহরবাসীর চলাচলের জন্য খোঁড়া হয়েছে পরিখা, আর বরফ জমে জমে রাস্তার উচ্চতা বেড়েছে বহুগুণ। কিন্তু তুষারপাত থামার কোনো লক্ষণ নেই; শুভ্রতা গ্রাস করেছে নদী, পাহাড় আর সমস্ত চরাচর। শুধুমাত্র স্কুলের প্রাঙ্গণে প্রতিদিন বরফ সাফ করার জন্য মাটির সাথে লেপটে থাকে বরফ যেন তাল তাল কাদা।

তানিয়া বেশ কিছুদিন ধরে স্কুলের দুপুরবেলায় বিরতির সময়টায় বরফ-পুতুল বানিয়ে সময় কাটায়। অবশেষে শেষ হলো কাজ। ছেলেরা ওকে সাহায্য করেছিল, কাজ শেষে মই আর জলের বালতি নিয়ে বেড়ার দিকে চলে গেল ওরা। তানিয়া পিছনে সরে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার এই সেরা কর্মটি দেখতে লাগল।

বরফ-পুতুলটি শিরস্ত্রাণ পরা চওড়া কাঁধের সেপাই, ঠিক যেন তার বাবার মতো, এটার বুক পকেটে পদকের ঘটা। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর শেষপ্রান্তের সেপাই রাইফেল নিয়ে ঝুঁকে আছে, প্রগাঢ় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে দূরে, আর সামনে বিশাল সমুদ্র ফুঁসে ওঠে বারবার। সত্যিকারের কোনো সমুদ্র নয়, তবুও এই ছবি থেকে থেকে ভেসে ওঠে মনে, তাই তো খোকাখুকুরা নীরবে তাকিয়ে রইল এই আশ্চর্য বরফ-পুতুলটির দিকে।

একটু বড়বয়সি ছেলেরা দারুণ উচ্ছ্বাসে তানিয়াকে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে লুফে নিল। কিছু মেয়েরাও আনন্দে হইচই করে উঠল, তানিয়া হতবাক হয়ে গেল, কথা ফোটে না মুখে তার। সে ভাবতেও পারেনি এত ভালো হবে তার বরফ-পুতুলটি। প্রথমে তার কোনো ধারণাই ছিল না আসলে সে কী বানাতে যাচ্ছে। কিন্তু যখন সে শুরু করল, এতটা নিমগ্ন হয়ে গেল, সেপাইয়ের হাতে ধরা রাইফেলের মাথায় একটা বেয়োনেট না দেওয়া পর্যন্ত থামল না, আরও একপ্রস্থ বরফ লেপটে দিলো ঠিক যেন ফৌজি উর্দিপরা নিষ্ঠাবান এক সেপাই।

দীর্ঘক্ষণ হিমশীতল জল আর বরফ নিয়ে কাজ করার দরুণ ঝিঁঝি দিয়ে উঠল তানিয়ার হাতের আঙুল, মুখে পুরে আঙুলগুলো গরম রাখার চেষ্টা করতে লাগল সে।

কলিয়া দূর থেকে দেখছিল সবকিছু, কেন যেন কাছে আসার সাহস পাচ্ছিল না। হইচই, চেঁচামেচি শুনে আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা কোট ছাড়াই প্রাঙ্গণে চলে এলেন, বরফ-পুতুলের গাম্ভীর্য দেখে যেন চমকে গেলেন মুহূর্তেই। সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখলেন তানিয়ার শিল্পকে।

মিহি তুষারের গুঁড়ো উড়ে উড়ে পড়ছে তার পশমি পোশাকে, গলায় পরা গার্নেট পাথরের তারা ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে, তবুও তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন আর মনে করতে লাগলেন তার শৈশবের কথা, খেলাধুলার কথা। কোথায় আজ সব হারিয়ে গেল?

তিনি একবার খেলার সাথিদের নিয়ে বরফ-পুতুল বানিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি আজও অমলিন। বাড়ির উঠোনের এক কোনায় রেখেছিলেন বরফ-পুতুলটি। রাতে চাঁদের আলোয় উঠোন আর বাড়ির লালরঙা ইটের দেয়াল চকমক করছিল। আলো-আঁধারির মাঝে ভীষণ জান্তব লাগছিল বরফ-পুতুলটিকে। গোলগাল মুখ আর বড় মাথা ছিল পুতুলটির। সাদা বরফের মাঝে কয়লা দিয়ে আঁকা কালো মুখ চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছিল। এক সন্ধ্যায় জানালা দিয়ে তিনি এরকম দৃশ্য দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন। মুখ লুকিয়ে একা একা কেঁদেছিলেন। কাউকে বলেননি এ ঘটনা। একরত্তি মেয়ে সারারাত বিছানায় জেগেছিল! রাত নিঝুম তখন, চাঁদের আধিভৌতিক আলোয় এটাকে মনে হচ্ছিল পাতালপুরীর এক পিশাচ।

আজ কুড়ি বছর পরে তানিয়ার গড়া এই বরফ-পুতুলটির দিকে নিগূঢ় দৃষ্টিতে তাকালেন, যেন নিশ্চিত হতে চাইলেন সেই গা-ছমছমে ভয়টা আর নেই।

সারা প্রাঙ্গণ জুড়ে বরফ-পুতুল। কোনোটা নাইট, আবার কোনোটা যোদ্ধা, এর মধ্যে রীতিমতো অশ্বারোহী নাইটও আছে। যদিও সবারটাই মনের মাধুরী মিশিয়ে বানানো, কিন্তু তানিয়ার বরফ-পুতুলের সমকক্ষ আর হয় না!

'এই সেপাই কি তুমি বানিয়েছ?' তানিয়ার দিকে ফিরে আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা জিজ্ঞেস করলেন।

তানিয়া মুখ থেকে আঙুল বের করে মাথা ঝাঁকাল।

'আপনি ঠান্ডায় জমে যাচ্ছেন, আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা,' তানিয়া বলল। 'এই পাথরের তারাটা ঝাপসা হয়ে গেছে। আমি কি এটা ধরতে পারি?'

তানিয়া হাত দিয়ে ঘষতেই চকচক করে ওঠে পাথরটা।

'সেরা বরফ-পুতুল বানানোর জন্য তুমি এটা পুরস্কার হিসেবে নেবে?'

তানিয়া আমতা আমতা করল।

'না, না, আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা। এই তারাটা আপনার পোশাকেই সবচেয়ে ভালো মানায়। এটা ছাড়া আপনাকে ভাবতেও পারি না,' বলেই তানিয়া গেটের দিকে দৌড়ে যায় যেখানে ফিল্কা তাকে ইশারায় ডাকছিল।

আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা ধীরে পায়ে হেঁটে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন আর ভাবছিলেন তানিয়ার কথা। আজকাল প্রায়ই সে উদাস হয়ে যায়, কিন্তু তার চলনে-বলনে কী লাবণ্য! মেয়েটা কি প্রেমে পড়েছে?

'প্রেমে পড়া ছাড়া এ বয়সে বুক দুরুদুরু করে কীসে?' শিক্ষিকা মুখ টিপে হাসলেন। 'কিন্তু ও চিবুচ্ছে কী? ঐ চীনা ফেরিওয়ালার ফালতু রজন নয় তো!তবে, এটা ঠিক, "পিরিতি রজনের আঠা, লাগলে পরে ছাড়ে না"! রজনের আঠায় কি জমাট বাঁধে ভালোবাসা?'ভাবতে ভাবতে আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা ক্লাসের দরজা বন্ধ করে তার কক্ষে চলে গেলেন। ছাত্রছাত্রীদের ওদের মতো থাকতে দিলেন।

তিনি ভুল বলেননি। ফিল্কা মস্ত এক খণ্ড রজন নিয়ে এসেছে আর ডাইনে-বাঁয়ে যাকে পাচ্ছে, সবাইকে ভাগ করে দিচ্ছে, শুধুমাত্র ঝেনিয়াকে ছাড়া।

'আমাকেও দে, ফিল্কা,' ঝেনিয়া চেঁচিয়ে বলল।

'মেয়েদের দিবি না কিন্তু, ফিল্কা,' ছেলেরা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল।

ওরা জানে ফিল্কা দিলদরিয়া মানুষ।

'কেন দেব না?' ফিল্কা জিজ্ঞেস করল। সে বলে চলল, 'ঝেনিয়াও যদি এখানে আসে, ওকে সবচেয়ে বড় টুকরাই দেব।'

ঝেনিয়াকে আর কিছু বলতে হলো না।

ফিল্কা পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাগজের ব্যাগ বের করে ঝেনিয়ার হাতে দিলো।

কাগজের ব্যাগ খুলতে খুলতে ঝেনিয়া অবাক হয়ে বলল, 'এত্তগুলো দিয়েছিস রে, ফিল্কা!'

কিন্তু ব্যাগ খুলে সে একটা সদ্যোজাত ছোট্ট নেংটি ইঁদুর দেখতে পেল। ঝেনিয়া চিৎকার করে উঠে ইঁদুরটিকে মেঝেতে ফেলে দিলো। আশেপাশের মেয়েরাও লাফিয়ে একপাশে সরে গেল।

মেঝেতে জমাট বরফে কাঁপতে লাগল ইঁদুরটি।

'কী করছ তোমরা?' তানিয়া রেগে গেল। 'আহা! এটা মরে যাবে যে!'

নিচু হয়ে বসে মেঝে থেকে তুলল ইঁদুরটিকে, আর বারবার ফুঁ দিতে লাগল যাতে এটা উষ্ণ হয়ে ওঠে। এরপরে কোটের পকেটে পুরে রাখল।

এই শহরের অচেনা এক লোক হঠাৎ করে তাদের সামনে এলো। মাথায় খ্যাঁকশিয়ালের চামড়ার সাইবেরিয়ান টুপি, গায়ে পশমি কোট, কিন্তু পায়ে হালকা ধরনের জুতো।

'ঐ যে, একজন আগন্তুক আসছেন!' ফিল্কা বলে উঠল। 'তাকে কোথাও দেখিনি।'

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোথাও দেখিনি,’ সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

লোকটা ওদের সামনে আসতেই একটা বাচ্চা মেয়ে তার কোটের এক প্রান্ত খামচে ধরে বলল, ‘আপনি কি স্কুলের পরিদর্শক?’

লোকটা উত্তর দিলো না, কিন্তু তানিয়ার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, ‘খুকি, তোমাদের অধ্যক্ষ বসেন কোথায়?’

সবাই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছে। যে কোনোকিছুই হতে পারে। লোকটা পরিদর্শক হতেই পারেন। অসম্ভব কী!

‘তোমরা আমার কথার উত্তর দেবে না, সোনামণিরা?’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন। তানিয়ার দিকে ফিরে আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘প্রিয়, আমাকে দেখিয়ে দাও তো, তোমাদের অধ্যক্ষ কোথায় বসেন।’

তানিয়া ভেবেছিল তার পিছনে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করেছেন, তাই সে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে ফিরে তাকাল।

‘হ্যাঁ, তুমি, তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি। বাদামি চোখের মেয়েটা, যার কাছে একটা ইঁদুর আছে।’

তানিয়া শব্দ করে রজন চিবুতে চিবুতে বড়বড় চোখ তুলে তাকাল। ইঁদুরটি কোটের পকেটে উষ্ণতা পেয়ে মাথা বের করে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। ইঁদুরটি দেখে মুচকি হাসি দিলেন লোকটা।

তানিয়া থুথু করে রজন বারান্দার বাইরে ছুড়ে ফেলল।

‘কে হতে পারে?’ জিজ্ঞেস করল কলিয়া।

একজন বলে উঠল, ‘সম্ভবত, ভ্লাদিভস্তক থেকে স্কুল পরিদর্শক এসেছেন।’

‘না, উনি একজন বীরযোদ্ধা,’ ফিল্কা উচ্চৈঃস্বরে বলল। ‘আমি তার বুকপকেটে পদক দেখেছি।’

****

তেরো

ওদের সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসানের পরে জানা গেল আগন্তুক আসলে একজন লেখক। ঈশ্বর জানেন এই হাড়কাঁপানো শীতে কেন ইনি হালকা ধরনের জুতো পরে আসলেন! খনি পরিদর্শকেরা ক্যানভাস কাপড়ের যে বুটজুতো পরেন, তার চেয়েও নাজুক এই জুতোজোড়া। শীত যে কীভাবে মানবে, বলাই বাহুল্য! কিন্তু তার ওভারকোট আর টুপি বেশ আরামদায়ক মনে হচ্ছে। শোনা যায় এই শহরেই তার জন্ম আর এই স্কুলেই পড়াশোনা করেছেন।

তিনি কি শৈশবের স্মৃতিরোমন্থনের জন্য এসেছেন? শৈশবের মতোই তার চোখেমুখে ঝাপটা দিচ্ছে হিমেল হাওয়া আর সাদা সাদা গুঁড়োর মতো বরফকুচিতে চোখের পাপড়ি ঢেকে যায়। বয়ে যায় একই নদী, আর দেখার ইচ্ছে জাগে কি তার মনে, কত কত গাছ আর ঝোপ বেড়ে চলেছে নতুন করে?

নাকি তিনি স্বীয় নামযশে বড্ড ক্লান্ত, নদীর মোহনার ওপরে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো পাখির মতন যে নদীতীরে দেওদার গাছের শাখায় নেমে আসে একটু নিবিড় বিশ্রামের জন্য!

তানিয়া এ সবই অনুমান করে।

সে ভাবল, তিনি যদি সত্যি সত্যি গোর্কি না-ও হন, তবুও তো একজন লেখক। যেহেতু ওর শহরে এসেছেন, তানিয়ার উচিত তার সাথে দেখা করা, তার সম্পর্কে জানা।

তিনি তেমন বয়স্ক না হলেও তার কপালের কাছে চুলে পাক ধরেছে, অদ্ভুত হলেও খনখনে ভারি গলা তার।

তানিয়া ভয় পাচ্ছিল পাছে তিনি প্রশ্ন করে বসেন যে, পুশকিনের লেখা পড়েছে কিনা অথবা তার নিজের লেখা আগ্রহ জাগায় কিনা।

কিন্তু তিনি বললেন,‘ধন্যবাদ, প্রিয়। তো, ইঁদুরটি নিয়ে কী করবে তুমি?’

লেখকের এমন মামুলি প্রশ্নে ওরা সবাই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

তিনি আসার আগে তাদের পাঠচক্রে কত-না আনন্দই হচ্ছিল! আলেকসান্দ্রা ইভানোভনার সভাপতিত্বে প্রতি দিন-দশেক পরপর পাঠচক্রের আসর বসে।

এই দিনে তারা সবাই পাইওনিয়রদের কক্ষে জড়ো হয়। লম্বা এক টেবিলে বসে সবাই আর কক্ষের একমাত্র হাতলওয়ালা চেয়ারে বসেন আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা। পাঠচক্রের আসরে তাকে অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশ আলাদা লাগে, মনে হয় যেন মায়াবী জাহাজে চেপে দূরদেশ থেকে এসেছেন।

চিবুকে হাত রেখে একমনে আবৃত্তি করে চলেন :

‘থমথমে সোনালি খেতে বহে

মাতাল সমীরণ,

বারে বারে ডাকে রুপালি স্বরে

শিহরিত বিজন বন।’

একটু থেমে কয়েক মুহূর্তের জন্য কী যেন ভাবেন, এরপরেই বলেন, ‘নাহ, আজ তোমাদের অন্যকিছু পড়ে শুনাই,

আর লেপটে আছে ঠোঁট দুজনার

আর ছিঁড়ে ফেলে সে পাপী জিভ আমার

বন্ধু আমার, জানে শুধু আলসেমি আর ছল।’

আহা! বাচ্চারা, আমি যদি তোমাদের বোঝাতে পারতাম! কবিরা হলেন শব্দের জাদুকর!’

কিন্তু ফিল্কা কিছুই বোঝেনি, সে নিজের জিহ্বা কামড়ে দিতে চাইল, তার মনে হয় এটা মুখগহ্বরে অকর্মা হয়ে পড়ে থাকে, পারে খাবার চিবানোর কাজে সাহায্য করতে, কিন্তু কোনো ধরনের কাব্যিকতা করতে পারে না।

তার মানে এই নয় যে, ফিল্কা নির্গুণ। সে হরবোলার মতো গলার স্বর নকল করতে পারে। এই যেমন, রাস্তার মোড়ে বসা চীনা ফেরিওয়ালার কণ্ঠও নকল করতে পারে।

‘তুইংগাম লাগবে? তুইংগাম! ছোতোছোতো তুকলা, বলো বলো তুকলা, ভালো ভালো তুকলা...’

ফিল্কা চীনা ফেরিওয়ালার সুর নকল করে বলতেই পুরো ক্লাস হাসির উল্লাসে ফেটে পড়ে।

এরপরে ঝেনিয়া সীমান্তরক্ষীদের নিয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনায় আর তানিয়া তার নিজের লেখা গল্প পড়ে শোনায়।

কলিয়া বাজে লেখার ভয়ে কিছুই লেখে না; কিন্তু সে সবার কবিতা আবৃত্তি আর গল্পপাঠ নির্মোহভাবে শোনে আর তীব্র সমালোচনা করে।

কিন্তু তানিয়া যখন পুরোনো ওভারকোটের আস্তিনে বাস করা এক নেংটি ইঁদুরের গল্প বলা শুরু করল, কলিয়া কোনোপ্রকার সমালোচনা করল না। একদিন গোলাঘর থেকে ওভারকোটটি বাইরে নেওয়া হলে জীবনে প্রথমবারের মতো তুষার দেখল ইঁদুরটি, আর ভাবল, রাজ্যের চিনি ছড়িয়ে আছে চারপাশে।

‘হায়রে মনিষ্যি! চিনি পায়ে মাড়িয়েও এদের কোনো আপসোস নাই!’ ইঁদুরটি ভাবতে লাগল। আর চিনির লোভে ওভারকোটের আস্তিন থেকে লাফিয়ে পড়ল বাইরে।

বেচারা ইঁদুর! কতক্ষণ বাঁচবে বলো?

তানিয়ার গল্প বলা শেষ হয়, কিন্তু কলিয়া সমালোচনার জন্য মুখ খোলে না। কলিয়ার এই নীরবতাকে তানিয়া প্রশংসা হিসেবে ধরে নিল, আর এই আত্মতুষ্টি নিয়ে সে সারাদিন আর সারারাত পার করল। এমনকি ঘুমের মাঝেও তার চোখে লেগেছিল তৃপ্তির চিহ্ন।

কিন্তু সকাল হতেই তার মোহভঙ্গ হয়। তার লেখাটি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

‘কত বোকা আমি! ওর মতো দাম্ভিক ছেলে সমালোচনা করেনি দেখে খুশি হয়ে গেছি!’ নিজেকে চোখ রাঙাল তানিয়া।

লেখকের আগমনে সবকিছুর পরিবর্তন হয়ে গেছে। তৈরি হয়েছে তার যত্নআত্তির প্রশ্ন।

এখন তারা ফুল পাবে কোথায়? লেখককে তো অন্তত একটা ফুলের তোড়া উপহার দিতে হয়। কিন্তু সবকিছু তো বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। এমনকি হর্সটেইলের পাতা আর দূর্বাঘাসও পাওয়া যাবে না।

এই সমস্যা সমাধানের কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না। তানিয়ার বাগানেও এখন আর কোনো ফুল নেই। কেউই কিছু ভেবে পেল না।

তবে বাস্তববাদী মেয়ে ঝেনিয়া বলে উঠল, ‘আমাদের বাড়িতে টবে লাগানো তুর্কি ক্যাপ ফুল আছে। কেবল কলি ফুটেছে।’

অন্য মেয়েরাও সমস্বরে বলে উঠল, ‘আমাদের বাড়িতেও জবা আর ফিউসা ফুল আছে।’

‘আর আমাদের বাড়িতেও...’ ফিল্কা বলা শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাড়িওয়ালীর বাগানে কোনো ফুল নেই আচমকা মনে পড়ায় থেমে গেল। তিনি বাগানে কিছু ফুলের চারা রোপণ করলেও ফিল্কার কুকুরেরা ফুলের চারা নষ্ট করে ফেলেছে।

যাই হোক, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বড় একটা ফুলের তোড়া তৈরি হলো।

পরের ধাপ হলো কে ফুলের তোড়া এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছা। লোকভর্তি স্কুলের বিরাট হলঘরে আলোয় উদ্ভাসিত মঞ্চে উঠে মহান মানুষটির সাথে হাত মেলাতে হবে আর তাকে ফুলের তোড়া এগিয়ে দিয়ে বলতে হবে, ‘নবীন পাইওনিয়রদের পক্ষ থেকে...।’

‘তানিয়াই পারবে!’ ফিঙ্কা চেঁচিয়ে বলল।

‘না, ঝেনিয়া যাবে,’ মেয়েরা ফেটে পড়ল চিৎকারে। ‘ফুলের তোড়ার সমাধান ও দিয়েছে।’

যুক্তিতর্ক মেয়েদের পক্ষেই যায়, কিন্তু কলিয়া ছাড়া সব ছেলেরা প্রতিবাদ করল। কিছুই বলেনি সে। অবশেষে যখন তানিয়াই নির্বাচিত হলো, কলিয়া তখন তার দুই চোখ হাত দিয়ে ঢাকল। কেউই বুঝতে পারল না কলিয়া আসলে কার পক্ষে আছে।

‘আর হ্যাঁ, তানিয়া,’ আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা বলে চললেন। ‘তুমি মঞ্চে উঠে আমাদের অতিথির সাথে করমর্দন করবে, এরপরে ফুলের তোড়া এগিয়ে দেবে। আর তুমি তো জানো কী বলতে হবে। ভুলে যেও না যেন! এবারে ফুলের তোড়াটা ধরো, প্রিয়।’

তানিয়া ফুলের তোড়া বুকের কাছে তুলে নিয়ে কক্ষের বাইরে চলে গেল।

আর এখান থেকেই তার দুর্ভোগের শুরু!

সে মহান মানুষটির সাথে হাত মেলাবে, আর ফুলের তোড়া উপহার দেবে। আজ থেকে অনেক বছর পরে, হয়তো বছর পাঁচেক পরে, সে তার বন্ধুদের সাথে গল্প করতে পারবে, সে কিছুটা হলেও দুনিয়া দেখেছে।

তানিয়ার মুখে হাসির দীপ্তি। সবার দিকে চেয়ে হাসল এমনকি ঝেনিয়ার দিকে চেয়েও। কিন্তু সে ঝেনিয়ার কুদৃষ্টি বুঝতে পারেনি।

‘কেন সবাই তানিয়া সাবানেয়েভাকে বেছে নিল? অন্যায়, এটা অন্যায়,’ ঝেনিয়া তার বন্ধুদেরকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল। ‘না, আমি নিজের জন্য বলছি না। কিন্তু আমরা তো জানি, কলিয়া ওর চেয়েও মেধাবী, আমি ভেবেছিলাম কলিয়াকে নির্বাচিত করা হবে। কিন্তু না, ছেলেরা তানিয়াকে চাইল। আমিও জানি কেন, কারণ সবাই ওর সুন্দর চোখের ফিদা হয়ে গেছে। এমনকি লেখকও ওর চোখ নিয়ে কী যেন বলেছেন।’

‘তিনি শুধু ওকে “বাদামি চোখের মেয়ে” বলেছেন,’ কলিয়া হাসতে হাসতে বলল।

কলিয়া আরও বলে চলল, ‘কিন্তু ঝেনিয়া, তুমি ঠিকই বলেছ। ওর চোখ দুটি সুন্দর। তোমারও তো ইচ্ছে হয় যদি ওরকম চোখ থাকত, তাই না?’

‘কে, আমি? কখনো না!’ ঝেনিয়া একেবারে ক্ষেপে উঠল।

তানিয়ার পক্ষে আর একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না। তার হাতে ধরে থাকা ফুলগুলো পাথরের মতো অসম্ভব ভারী মনে হলো। কিছুদূর দ্রুত পা চালিয়ে এরপরে ছুটতে আরম্ভ করল। সে শ্রেণিকক্ষ ছাড়িয়ে, হলঘর ছাড়িয়ে দৌড়াচ্ছে, হলঘর থেকে চেয়ার টানাটানির শব্দ শোনা যাচ্ছে, তার মানে কিছুক্ষণের মধ্যেই সভা শুরু হতে যাচ্ছে।

ধুপধাপ দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচতলায় নামল। জনশূন্য অন্ধকার ক্লোকরুমে এসে হাঁফাতে লাগল। তাকে এর আগে কখনো এমন দ্বেষপূর্ণ মুখর মুখের সামনে পড়তে হয়নি। আজশুধু শুনে যেতে হয়েছে।

‘ও যা আমায় বলল, তা কি সত্যি?’ নিজেকে প্রশ্ন করল সে। ‘যদি সত্যি হয়, তাহলে পাইওনিয়র হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। আমার কিচ্ছু যায়-আসে না যদি ফুলের তোড়া দেওয়ার সুযোগ হারাই। এসব কথা শোনার চেয়ে বরং আমি যাব না।’

তার পুরো শরীর টলতে লাগল।

নাহ, ওসব বাজে কথা। ওরা যা বলল, তা সত্যি নয়।

তবুও সে নিজের চোখের দিকে তাকাল।

দিনের এই সময়টায় জনশূন্য ক্লোকরুম যেন বনপথের মতো অন্ধকার আর ছায়াময়। সাদা দেয়ালের সামনে পেল্লায় এক পুরোনো আয়না ঝুঁকে আছে। বাচ্চারা আয়নার সামনে দিয়ে দৌড়ে গেলেই নড়ে ওঠে এটার মিশমিশে কালো স্ট্যান্ড। আয়নায় আলোছায়া খেলা করে, উড়ে চলে মেঘের দঙ্গল।

কিন্তু এখন কেন যেন সবকিছু স্থির হয়ে আছে। প্রহরী স্ট্যান্ডের পাশে দোয়াতদানি ধুয়েমুছে সাফসুতরো করে তাকে তাকে সাজিয়ে রেখেছে।

মেঝেতে পরপর তিনটে বোতলে কালি রাখা আছে–ছোট্ট একটা বোতল, তার পাশে কোয়ার্ট আকারের আরেকটা বোতল, শেষে একটা বড় ফ্লাস্ক।

দুনিয়ায় এত কালি কার লাগে?

সাবধানে বড় ফ্লাস্কের পাশ দিয়ে হেঁটে তানিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াল।

চারপাশে তাকাল সে, কাছেপিঠে কোথাও প্রহরীকে দেখা গেল না। আয়নার ওপরে কনুইয়ের ভর রেখে মুখ সামনে আগায় তানিয়া। তার মায়ের চোখের মতো গোধূলির চেয়েও ধূসর দুটি চোখ আয়নায় উঁকি দেয় আঁধারের মাঝে। এই বড়বড় চোখদুটি কল্পনাবিলাসী। আলো-আঁধারির খেলা চলে চোখের তারায় যেন তা অতল সাগর জল।

তানিয়া আয়নার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বিহ্বল হয়ে পড়ল যেমন করে বনের পশু জীবনে প্রথমবারের মতো জলে দেখে নিজের প্রতিবিম্ব। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

নাহ, তার এ চোখ দুটি খুবই সাধারণ।

হতাশ হয়ে উঠে পড়ল সে। সাথেসাথেইতার ভঙ্গি অনুসরণ করে আয়নাটাওযেন দুলে উঠল আর সে দুলুনিতে কেঁপে ওঠে কালির বোতল। নড়ে উঠে গড়াতে শুরু করল বোতলগুলো আর পরিশেষে গড়াতে গড়াতে ধাক্কা লাগল দোয়াতদানির সাথে। তানিয়া হাত বাড়াতেই বোতলগুলো যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল আর হাত ফাঁকি দিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। বোতলগুলো মেঝেতে পড়ে অক্টোপাসের মতো কালো কালি উগড়ে দিলো।

প্রত্যেকের জীবনে একবারের জন্য হলেও যা ঘটে, আজ তাই ঘটল তানিয়ার সাথে–কালি মেখেছে সে।

'কী বিশ্রী হয়ে গেল ব্যাপারটা!' আঁতকে উঠল তানিয়া।

মেঝে থেকে দ্রুত ফুলের তোড়াটা হাতে তুলে নিল। শ্বেতজবার বিবর্ণ পাপড়িতে কয়েক ফোঁটা কালি চকচক করছে। এটা কোনো সমস্যা নয়, কয়েকটা পাপড়ি তুলে ফেললেই হয়! সে হতাশ হয়ে হাতের তালু চোখের সামনে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখতে লাগল। একদম কবজি পর্যন্ত কালি মেখে গেছে।

'হায় ঈশ্বর!'

কথাটা তার এত কাছ থেকে উচ্চারিত হলো যে, তানিয়ার মনে হয়েছে সেই বলেছে কথাটা।

সে মাথা তুলে তাকায়। কলিয়া তার পাশে দাঁড়িয়ে তার হাতের দিকে চেয়ে রইল।

'কী করে হলো!' সে বিড়বিড় করল। চোখে তার অবিশ্বাস। 'কী করে এখন লেখকের সাথে হাত মেলাবে? তিনি ইতোমধ্যে চলে এসেছেন। শিক্ষকদের কক্ষে আছেন। সবাই অপেক্ষা করে আছে। আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা আমাকে পাঠিয়েছেন তোমায় ডাকতে।'



কয়েক মুহূর্তের জন্য তানিয়ার মনে হলো সে স্থবির হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগেও যে চোখজোড়া আয়নায় জ্বলজ্বল করছিল, এখন তা মলিন হয়ে গেছে।

কী দুর্ভাগ্য!

সে ফুলগুলো কলিয়ার সামনে তুলে ধরল। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে সে এতটুকু বলতে পারল, 'এগুলো নিয়ে যাও। ঝেনিয়াই উপহার দিক। ওরও স্মৃতিশক্তি খুব ভালো।'

তানিয়া ভাবছিল কলিয়া হয়তো ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে নিবে। হয়তো এটা নিয়ে পরে কলিয়া আর ঝেনিয়া হাসাহাসি করবে।

কিন্তু তানিয়া কিছু বলল না। সে ফুলের তোড়া হাতে নিয়েই কলিয়ার কাছ থেকে উঠে পড়ল, আর দুই সারি বাচ্চাদের কোটের মাঝ দিয়ে ছুটল। স্নানের ঘরে ঢুকে কালি মুছে ফেলার জন্য জমানো সব জল খরচ করে ফেলল। উপায়ান্তর না দেখে শেষে বালু দিয়ে কালির জায়গা ঘষল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। হাতের কালি হাতেই লেগে রইল।

'কলিয়া সবাইকে বলে বেড়াবে। আমি জানি, সে করবেই। সে আলেকসান্দ্রা ইভানোভনাকে বলবে, ঝেনিয়াকে বলবে, সবাইকে বলবে,' তানিয়া ভাবতে লাগল।

আর হবে না! তার আর মঞ্চে ওঠা হবে না, মহান মানুষটির সাথে হাত মেলানো হবে না, তাকে ফুলের তোড়া উপহার দেওয়া হবে না। সে অবাক হয়ে ভাবে, ফুল তার জন্য কতটা অশুভ! অথচ সে ফুল ভালোবাসে।

প্রথম ঘটনা হলো, এক অসুস্থ ছেলেকে ফুলগুলো দিলো, পরে দেখা গেল ছেলেটা কলিয়া! মার্শলিলি ফুল ছিল সেগুলো।

আর এই দ্বিতীয় ঘটনা হলো, টবে ফোটা ফুল নিয়ে দুর্ভাগ্য! আজ যদি তানিয়ার জায়গায় অন্য কোনো মেয়ে হতো, তবে কত প্রশংসা পেত!

হ্যাঁ, তানিয়াকে এই ফুলগুলো অন্য কাউকে দিয়ে দিতে হবে।

তানিয়ার হাত বেয়ে জল ঝরে। স্নানের ঘর পেরিয়ে ক্লোকরুমে এসে হাত না মুছে ধীরে ধীরে বাইরে বেরুল। এখন অফুরান সময় তার। এখন আর কী আসে যায়!

সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আলসে ভঙ্গিতে বারান্দাজুড়ে হেঁটে বেড়ায়। বারান্দা থেকে বাইরে তাকায় তার সেই প্রিয় গাছটিকে দেখার জন্য।

সে জানে এই গাছটা দেখলে কতটা ভালো হয়ে যায় তার মন। কিন্তু হায়! সে ভুলেই গিয়েছিল বারান্দার এই পাশ থেকে গাছটিকে দেখা যায় না।

জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয় সে। তৎক্ষণাৎ দেখতে পেল লেখক বারান্দা পেরিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন।

তিনি ভারী ওভারকোটের বদলে উঁচু কলারের লম্বা এক ককেশীয় জামা পড়ে আছেন, কোমরে রুপালি বেল্ট বাঁধা।

কপালের কাছে তার পক্ক কেশ রুপালি লাগে, কোমরে বাঁধা রুপালি বেল্ট জ্বলজ্বল করছে। তার জামায় এত বোতাম যে গুণতে যেয়ে তানিয়া খেই হারিয়ে ফেলছিল।

তিনি খুব দ্রুত হাঁটার জন্য তাদের মধ্যেকার দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। আরেক মুহূর্ত পার হলেই তিনি বারান্দার কোণ পার হয়ে শিক্ষকদের কক্ষে চলে যেতেন, আর তাকে হারিয়ে ফেলত চিরতরের জন্য।

‘কমরেড লেখক!’ তাকে ডাকল তানিয়া। কণ্ঠে তার হতাশার ছোঁয়া।ডাক শুনেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন আর পিছন ফিরে তাকালেন। ভ্রু কুঁচকে রইলেন তিনি, বুঝতে পারছেন না মেয়েটা কী চাইছে।

মেয়েটি তাকে কেন থামাল, তাকে কী ফুল দিতে চায়?

তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন তানিয়ার হাতে ধরে থাকা ফুলের তোড়ার দিকে। কেননা তিনি এরকম ফুলেল শুভেচ্ছা পেতে অভ্যস্ত।

‘কমরেড লেখক, আপনি কি হৃদয়বান?’ তানিয়া জিজ্ঞেস করল।

তিনি একটু কুঁজো হয়ে তানিয়াকে বোঝার চেষ্টা করলেন।

‘প্লিজ, বলুন আমাকে, আপনি কি হৃদয়বান?’ আবার জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

তার কণ্ঠে আর্জির সুর ভাবিত করে তুলল লেখককে।

‘আমাকে জানতেই হবে, কমরেড লেখক। আপনি হৃদয়বান কিনা?’ তৃতীয়বারের মতো জিজ্ঞেস করল সে।

তিনি কী উত্তর দেবেন ওকে।

‘আমি হৃদয়বান কি না এটা তোমার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন, প্রিয়?’

‘আপনি যদি সত্যি হৃদয়বান হয়ে থাকেন, তবে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন না।’

‘কেন, তুমি কি কোনো ভুল করেছে?’

‘ওহ, না, না! আমি তা বলতে চাইনি। পাইওনিয়রদের পক্ষ থেকে আপনাকে ফুলের তোড়া উপহার দিতে বলা হয়েছে। আর তখন আপনি আমার সাথে হাত মেলাতে চাইবেন। কিন্তু আপনি তা করবেন না। একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছে আমার সাথে। দেখুন,’ এই বলে তানিয়া তার হাতখানা দেখাল। তার সরু হাত আর লম্বা লম্বা আঙুলে কালি মেখে আছে।

তিনি জানালার গোবরাটে বসে তানিয়াকে কাছে ডেকে হো হো করে অট্টহাসি দিলেন।

তার গলার স্বরের চেয়েও অদ্ভুত লাগল তার এই উচ্চগ্রামের সুরেলা হাসি।

‘তিনি অবশ্যই ভালো গাইতে জানেন,’ তানিয়া ভাবল। ‘কিন্তু আমি বললে কি তিনি গাইবেন?’

‘বেশ! বেশ!’ বলতেবলতে উঠে দাঁড়ালেন আর তার হাতদুটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাড়তে নাড়তে বারান্দাটা পার হলেন।

মস্কো থেকে এই লম্বা ভ্রমণের পরে এটাই ছিল তার জন্য আনন্দের মুহূর্ত। এই আনন্দের রেশ সারা সন্ধ্যায় তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

যখন তিনি স্মিত হাসিতে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন, তাকে বেশ আমুদে লাগছিল। তিনি তার চেয়ারটি নিয়ে মঞ্চের একেবারে কিনারে বসলেন যাতে দর্শক-শ্রোতাদের কাছাকাছি থাকতে পারেন। তিনি সবার হর্ষধ্বনি থামার অপেক্ষা না করে তার গল্পপাঠ শুরু করে দিলেন। তার গল্পপাঠ শুরু হতেই সবার উল্লাস থেমে গেল। পুরো হলঘর জুড়ে বিরাজ করছিল এক অখণ্ড নীরবতা। তানিয়া নির্ভার আর কৃতজ্ঞচিত্তে শুনে যেতে লাগল এই গল্পপাঠের আসর।

‘পুত্র বেছে নিল তারুণ্যের পথ আর পিতা রইলেন ভিন্ন পথে। দুইজনকেই আলাদা হয়ে যেতে হলো নিজ নিজ চাহিদায়। এই বিচ্ছেদ বড্ড বেদনার।’

অবাক হলেও সত্যি যে, কথা বলার সময় লেখকের যে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, তার চেয়ে বেশ আলাদা লাগছে এখন। দরাজ গলায় পাঠ করছেন তিনি। ট্রাম্পেটের বাজনার মাঝেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তার পাঠ, বেহালার করুণ সুরের চেয়েও দুঃখ-জাগানিয়া তার গলার সুর!

গল্পপাঠ শেষ করলেন তিনি। সাথে সাথেই হর্ষধ্বনির ঝড় বয়ে গেল পুরো হলঘরে।

কিন্তু তানিয়া হাততালি দেয়নি। সে তার জ্যাকেটের পকেটে তার হাত গুঁজে রাখল। হাত বাইরে বের করার সাহস পাচ্ছে না। ফুলের তোড়া তার কোলে পড়ে আছে। সে আলেকসান্দ্রা ইভানোভনার দিকে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে তার ইশারার জন্য।

হুল্লোড় থেমে যেতেই লেখক তার বই বন্ধ করে মঞ্চের কিনারা ছেড়ে উঠে পড়তেই আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা মাথা ঝাঁকালেন। তার কালিমাখা হাত পকেটে রেখে সে অন্য হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে মঞ্চে উঠে পড়ল। কিন্তু লেখকের কাছাকাছি পৌঁছাতেই তার চলার গতি ধীর হয়ে এলো।

তানিয়া তার উজ্জ্বল চোখে লেখকের শান্ত ও অনুজ্জ্বল চোখের দিকে তাকাল।

‘তিনি কি ভুলে গেছেন সব কথা?’ তানিয়া মরিয়া হয়ে ভাবল। ‘আমি এখন কী করব?’

ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে।

‘আমাদের নবীন পাইওনিয়রদের পক্ষ থেকে–’ বলতে বলতেই থেমে গেল সে। কিন্তু তিনি ভুলে যাননি। তিনি ওকে কথা শেষ করতে দিলেন না। তিনি ছুটে যেয়ে নিজেই ফুলের তোড়া নিলেন ওর কাছ থেকে আর সেটা টেবিলের ওপরে রাখলেন। এরপর ওকে জড়িয়ে ধরে মঞ্চ থেকে নামতে সাহায্য করলেন। দর্শকদের ভিড়ের ধাক্কা যেন ওর গায়ে না লাগে, এজন্য আগলে রাখলেন ওকে।

একটা বাচ্চা মেয়ে লেখকের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ‘তুমি কি সত্যিই লেখক?’

তিনিও সরস উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, যতদূর আমি জানি।’

‘বেশ, আমি এর আগে কখনো সত্যিকারের লেখক দেখিনি। কিন্তু আমার মনে হয় না, তুমি সত্যিই লেখক।’

‘কেন মনে হয় না?’

‘উঁহু, আমি ভাবতাম সত্যিকারের লেখকেরা অনেক মোটাসোটা হয়।’

তিনি ওর সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালেন, আর বাচ্চারা সবাই তার চারপাশে ভিড় জমাল। ভিড়ের আড়ালে তিনি হারিয়ে গেলেন। বাচ্চারা তাকে ছুঁয়ে দেখল, উল্লাস করল। ওদের উল্লাসের শব্দে যেন কানে তালা লেগে যায়। খ্যাতি এর আগে এমন মধুর কখনো লাগেনি তার। কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি হাত দিয়ে চোখ ঢাকলেন।

তানিয়া তার কাঁধ ঘেষে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ সে টের পেল কে যেন ভিড়ের মধ্যে তার হাত ধরে টান দিচ্ছে, তার পকেট থেকে তার হাত টেনে বের করার চেষ্টা করছে। তানিয়া চিৎকার করে সরে এলো। ভালো করে তাকিয়ে দেখল এটা কলিয়া।

তার হাত ছাড়াবার জন্য তানিয়া কবজি মোচড় দিলো, কিন্তু বেশিক্ষণ তার প্রতিরোধ টিকল না। তার হাত যেন অবশ হয়ে উঠছে। অবেশেষে কলিয়া পকেট থেকে তার হাত বের করতে পারল।

তানিয়া ভেবেছিল কলিয়া তার কালিমাখা হাত উঁচু করে সবাইকে দেখাবে, কিন্তু না, সে তার দুই হাতের মাঝে তানিয়ার কালিমাখা হাত রাখল।

‘আমি তোমায় নিয়ে ভয়ে ছিলাম,’ কলিয়া কোমল স্বরে বলল। ‘আমি ভেবেছিলাম সবাই তোমায় নিয়ে হাসবে। কিন্তু তুমি একেবারেই আলাদা! অসাধারণ! আর আমার সাথে কোনো দ্বন্দ্ব নয়, প্লিজ। স্কুলের নববর্ষের পার্টিতে আমি তোমার সাথে নাচতে চাই।’

তানিয়া তার কথায় চিরাচরিত কোনো উপহাসের সুর খুঁজে পেল না।

কলিয়া তার কাঁধে হাত রাখল যেন পার্টি শুরু হয়ে গেছে আর তারা স্কুলের হলঘরে ওয়ালজ নাচবে।

দ্বিধাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল তানিয়ার মুখ।

হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, আর তা যেন ছড়িয়ে পড়ল তার দুই চোখে। লাজুক হাসিতে ছোট হয়ে আসে তার চোখজোড়া। সংযমের বাঁধ ভেঙে সে তার কালিমাখাহাত কলিয়ার কাঁধে রাখল।

হঠাৎ ফিল্কা ওদের কাছে চলে এসে দুই বাহু বাড়িয়ে ওদের জড়িয়ে ধরল। ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবলেশহীন ফিল্কার মুখ তিক্ততায় ভরে উঠল।

‘আচ্ছা! তোমাদের তাহলে মিলমিশ হয়ে গেছে!’

তানিয়া তার মাথা নিচু করে ফেলল।

‘কী বোকার মতো কথা বলছ, ফিল্কা!’ তানিয়ার লাজুক মুখ যেন আরও আরক্ত হয়ে উঠল। ‘কলিয়া শুধুমাত্র জিজ্ঞেস করছিল কাল আমাদের বাড়ির পার্টিতে আসতে পারবে কিনা, আর আমি বলেছি যদি ইচ্ছে হয়, তবে আসতে।’

‘হ্যাঁ, আমি জানি,’ স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলল ফিল্কা। ‘কাল তো তোমার জন্মদিন। আমি কি আমার বাবাকে নিয়ে আসতে পারি? তার ভীষণ ইচ্ছে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাবে।’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই নিয়ে এসো,’ হড়বড় করে বলে ফেলল তানিয়া। ‘আমার মনে হচ্ছে পার্টিটা চমৎকার হবে। তুমিও আসবে। আসবে না, বলো, কলিয়া?’ কলিয়ার আস্তিন ছুঁয়ে বলতে লাগল তানিয়া।

আচমকাই ফিল্কা ওদের মাঝ দিয়ে গটগট করে হেঁটে চলে গেল, আর বাচ্চাদের ভিড় আরও বড় স্রোতের মতো ওর পিছুপিছু চলল।

****

এই শহরে নববর্ষের পূর্বক্ষণ শান্তিপূর্ণভাবেই আসে। নেই তুষারঝড়ের ঘনঘটা।আকাশ কখনো পরিষ্কার,কখনো-বা মেঘাচ্ছন্ন।কিন্তু আকাশে তারা যখন ওঠে,স্বমহিমায় মিটমিট করে জ্বলে ওঠে। কুজ্ঝটিকার ওপরে আধেক আকাশ পাড়ি দেয় রুপালি পালের নৌকার মতো চাঁদ।

গ্রীষ্মকালের উষ্ণতম রাতের চেয়েও নববর্ষের আগের রাত তানিয়ার কাছে ভীষণ প্রিয়। এই রাতে তার জেগে থাকার অনুমতি আছে। আজকের দিনটা তার। যদিও গতকাল তার জন্মদিন ছিল, কিন্তু আজকের উৎসবের জন্য এইদিনে জন্মদিন পালন করে।

এই রাতে শহরবাসীরা ঘুমায় না।ফুটপাতের বরফ সাফ করা হয়। শহরময় ঘুরে বেড়ায় লোকজন। রাতের নৈঃশব্দ্য হারিয়ে যায় গান আর হাসির কলতানে।

নববর্ষের দিন তানিয়ার মা হাসপাতাল থেকে ছুটি নেন। তানিয়া স্কুল থেকে ফিরে বাড়ির বারান্দায় এসেই চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমাকে ছাড়া পাই বানিও না।'

তার মা ময়দামাখা হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তানিয়ার কাণ্ড দেখেন। তানিয়ার কাছে মনে হয় তার মায়ের হাতদুটি যেন পাখা, আর যেন যেকোনো মুহূর্তে তিনি উড়ে যাবেন আকাশে। কিন্তু তার দিকে তাকালে দেখা যাবে, তিনি তানিয়ার কাছে ঝুঁকে ওর ললাটে চুমু খাচ্ছেন।

'শুভ জন্মদিন, মামনি। আজকের পার্টি বেশ জমকালো হবে।আমরা এখনো কিছু করিনি। তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি।'

তানিয়া কোনোক্রমে স্কুলের বইগুলো বইয়ের তাকে ছুড়ে ফেলে তাড়াহুড়ো করে তার পুরোনো পোলকা ডটের পোশাকটা পরে নেয়।পুরোনো পোশাকটা তার বাড়ন্ত শরীরে উজানে চলা নৌকার পালের মতন আঁটোসাটো হয়ে ফুলে ফেপে উঠেছে।

তার মা তাকে দেখে মাথা ঝাঁকান।

'খুকুমনি আমার কত বড় হয়ে গেছে!' সপ্রশংস দৃষ্টিতে বলেন তার মা।

তার মায়ের ময়দামাখা হাতের কথা ভুলে যেয়ে তানিয়া তার হাত ধরে নাচতে শুরু করল।

'ময়দা লেগে যাবে হাতে!' তার মা তানিয়াকে সতর্ক করেন।

কিন্তু তার মা যেন এক আঁটি খড়ের চেয়েওহালকা। মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে সারা ঘরে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল।

নানি ঘরে ঢুকতেই তানিয়া নাচ থামাল। দুজনেই নানির দিকে বিব্রত হয়ে তাকিয়ে রইল।

'ভাদ্দুরে কুত্তির মতো হইছিস তোরা?' বুড়ি চেঁচিয়ে উঠলেন,'কাজকম্ম ভুলে এসব কী!'

আনন্দময় মুহূর্ত এরপরে শুরু যখন অতিথিদের জন্য আয়োজন শুরু হলো।তানিয়া তার মায়ের সাথে সাথে রান্নার কাজে অংশ নেয়।তানিয়া পপি বীজ পিষতেই ড্যান্ডেলিওনের ক্ষীরেরমতোদুধ-সাদা রস বেরুল। সারাদিন তাকে ভাঁড়ার ঘরে আসা-যাওয়া করতে হয়।বাইরে কী ভীষণ ঠান্ডা!ভাঁড়ার ঘরে সমস্ত খাবার জমে গেছে। মাংস জমে পাথরের মতো এত শক্ত হয়েছে যে করাত ছাড়া কাটার উপায় নেই।দুধও জমে শক্ত হয়েছে।তানিয়া জমে যাওয়া দুধ ছুরি দিয়ে ছিঁড়ে আনল সুতোর মতো করে, আরমিনিটখানেকের মধ্যেই তার দুই হাত রজনের মতো গুঁড়োয় ভরে উঠল।রুটি ছিল বাদামি আর খরখরে,দেখে মনে হয় বাসি হয়ে গেছে।কিন্তু তানিয়া জানে কী করে এসব তাজা করা যায়।আগুনের আঁচে গরম করে নিতে হবে শুধু।রান্নাবান্নার পরে মাংস থেকে সুস্বাদু ঝোল বেরুল, জ্বালে জ্বালে বলক উঠল দুধে, আর রুটি থেকেও সুঘ্রাণ বেরুচ্ছে।

তানিয়া এবার যাবে বাড়ির পিছনে ছোট্ট বনে স্কি করতে।স্কি করার ঢালু জায়গা বেয়ে নামার সময় যেখানে নবীন ফার গাছের ছুঁচালো-ডগা উঁকি দেয়,তানিয়া থমকে দাঁড়ায় সেখানে।নবীন ফার গাছের গাঢ় নীল নরম কাঁটাগুলো তার ভীষণ প্রিয়।ছুরি দিয়ে ফার গাছ কেটে কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়ি নিয়ে আসে সে।

এটা এত ছোট যে, মেঝেতে রাখা যায় না, সেটুলে সাজিয়ে রাখে। ফোঁটা ফোঁটা রজন লেগে আছে ফার গাছে। তানিয়া তা তুলে এনে চিবায়। দীর্ঘক্ষণ রজনের ঘ্রাণ সারাঘরে ভুরভুর করে।

সোনালি ফিতে তারা গাছটির রুপালি কাণ্ডে আর ছোট্ট ছোট্ট ডালে পাকায়, সাথে ঝুলিয়ে দেয় চকমকে তারকা।

আজকের দিনটা কীআনন্দের!তার বন্ধুরা সবাই এলো। তানিয়া উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল তাদের।হাসপাতাল থেকে আনা গ্রামোফোনটা চালু করেন তানিয়ার মা।

কোনো কারণ নেই, তবুও তানিয়া ভাবে আজকের পার্টি আনন্দমুখর হবে না। তার বাবা আসবে, নিশ্চয়ই সাথে কলিয়াও আসবে, যদি না সে সিদ্ধান্ত বদলায়।

'আমি জানি, আবার আমি তাকে আঘাত দিয়েছি,' তানিয়া মনে মনে বলল। 'কেন করলাম আমি?'

মানুষের মন কত বিচিত্র!

ফিল্কার মতো বোকারাম একটা ছেলের কথায় যদি কলিয়ার আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়,যদি উবে যায় তার হৃদয়ের উষ্ণতা, আরফিরিয়ে নেয় বাড়িয়ে দেওয়া বন্ধুত্বের হাত! কী হবে তখন! আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল তানিয়া।

তানিয়া তার কাঁধের ওপরে তাকাল যেখানে কলিয়া হাত রেখেছিল।আজ সেই স্পর্শের চিহ্ন রইল না আর।

সে মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকাতেই তার মাকে দেখতে পেল। তিনি ওর রিপোর্ট কার্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এবারে তানিয়া সচারাচরের চেয়ে কম নম্বর পেয়েছে।কিন্তু সে ভাবল, এবার হয়তো তার মা উৎসবের জন্য কিছু বলবেন না।

তিনি তার কন্যার দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইলেন যেন তার এই কিশোরী কন্যাটি এখনো ছোট্টটি আছে।

তিনি আজ রেশমের কালো পোশাক পরেছেন,তার ঋজু গ্রীবায় কুঞ্চিত কেশ বিজলি বাতিতে চিকচিক করছে। তার চেয়ে বোধহয় সুন্দরী কিংবা মিষ্টি দেখতেকেউ নেই এখানে।

'বাবা কেন এটা বুঝলেন না?' তানিয়া ভাবল।

পেঁজা তুলো লেগে আছে তার মায়ের পোশাকে। তিনি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন সেটা।

'বাবা শিগগিরই চলে আসবেন,'তানিয়া বলল।

'হ্যাঁ, আমিও অপেক্ষা করে আছি,' চটপট উত্তর দিলেন তার মা। 'নাদিয়াকেও আসতে বলেছি।'

'ওহ, তিনি যদি না আসতেন!' তানিয়া না ভেবেই বলে উঠল।

'কেন তানিয়া?' তার মা বিস্মিত হলেন।

'আমরা তাকে চাই না।'

'কিন্তু কেন, বোকা মেয়ে?'

উত্তর দেওয়ার বদলে তানিয়া তার মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে ফার গাছের চারপাশে নাচতে শুরু করল। নাচতে নাচতে তানিয়া ভাবল, কখনোকখনোবাচ্চাদের মতো বড়রাওতাদের মনেরকথা লুকিয়ে রাখে। বারান্দায় কারও পায়ের আওয়াজ শুনতেই থেমে গেল তারা।

'তোমার বাবা এসেছে বোধহয়' বলতে বলতেই হেসে উঠলেন তিনি, 'থামো এবার, তানিয়া।'

তানিয়া ঘরের কোণে সরে এলো।

'কলিয়াও এসেছে?' ভাবতে ভাবতেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ।

কিন্তু দেখা গেল কলিয়া নয়, তানিয়ার পাইওনিয়র দল থেকে তার তিন বান্ধবী এসেছে। ঘরের কোণ থেকে তাদের সামনে চলে এলো দেখা করার জন্য।

'আমরা কি নাচতে পারব রে, তানিয়া?' মেয়েরা জিজ্ঞেস করল। বাইরের হিমেল হাওয়ায় তাদের মুখ লাল হয়ে গেছে, জ্বালা করছে তাদের চোখ।

'তা আবার জিজ্ঞেস করতে হয়! সব পারবি রে,' তানিয়া উত্তর দিলো। 'আমি গ্রামোফোনটা চালিয়ে দিচ্ছি।'

গানের আওয়াজে গমগম করতে লাগল পুরো বাড়িটা।

এরপরে তানিয়ার বাবা নাদিয়াকে নিয়ে চলে এলেন। তিনি বারবার তানিয়াকে জড়িয়ে ধরেজন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন।

নাদিয়া তানিয়াকে একজোড়া পশমি জুতো আর একটা পুঁতি বসানো লম্বা ইভেঙ্ক পশমি কোটউপহারদিলেন।

কিন্তু কলিয়া তাদের সাথে আসেনি।

'কলিয়া কোথায়?' তানিয়ার মা জিজ্ঞেস করলেন।

'ছেলেটা খুব জেদি,' তার বাবা বলে চললেন। 'ও আমাদের সাথে আসতে রাজি হয়নি। তোমার জন্য নাকি একটা উপহার নিয়ে আসবে, তানিয়া।'

পরের ধাপে চলে এলো ফিল্কার পরিবার। তার বাবা, মা,তার তিন ছোট ভাই কুকুরে টানা স্লেজে চেপে এলো।

ফিল্কার তিন ভাইয়ের মুখ বাদামি রঙের,আর ওরা সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়েতানিয়ার সামনে মাথা নিচু করে সম্মান জানাল।ওরা পকেট থেকে নিঁখুত করে ভাজ করা রুমাল বের করে নাকমুছল। তাদের বাবা ছেলেদের কীর্তি দেখে গর্বিত হলেন।তাদের মা নীরবে পাইপ টানতে লাগলেন। তার তামার ছোট্ট পাইপটা ঝিলিক খেলে মোমবাতির আলোয়।

তানিয়ার বান্ধবীরা ছুটে যেয়ে ফিল্কার ছোট্ট ভাইদেরজড়িয়ে ধরে গাল চটকায়।তানিয়া চুমু খায় ওদের।

তানিয়া তার মায়ের দিকে নজর রাখল, নাদিয়া সারা সন্ধ্যা তার মায়ের কাছাকাছি ছিল। তানিয়া তাদের কয়েকবার আলাদা করার জন্যচেষ্টা করল।সে তার মায়ের পশমি কোট ধরে টানল, কিন্তু প্রতিবারই তার মা তানিয়ার কাঁধে চাপড় দিয়ে আবার নাদিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলেন।

গ্রামোফোনটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অতিথিরা চেঁচামেচি করতে লাগল। তানিয়া উঠে যেয়ে আবার চালু করল গ্রামোফোন।

গ্রামোফোনে পিনের নিচে একটা কালো চাকতি ঘুরতে থাকে, আর তার সরু প্রান্তে যেন ফুলকি ছোটে। পিনের সূঁচালো ডগায় যেন পাইপ আর বাঁশি যোগে বাজে অর্কেস্ট্রা।

কলিয়া এখনো আসেনি।

'কোথায় আছে সে?' ভেবে ভেবে তানিয়ার বুকে ব্যথা করে ওঠে।

বাচ্চারা ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে, তাই ঘরে সাজানো ফার গাছ আর সিলিং-এ ঝোলানো কাগজের প্রদীপদানি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তানিয়ার বাবা নাচিয়েদের সাথে যোগ দিলেন। উচ্ছল লাগছিল তাকে। তার নাচ সবাইকে মুগ্ধ করছিল।

'দেখো তানিয়া, দেখো!' তার মা তানিয়াকে বারবার বলে চললেন। 'দেখো, তোমার বাবা কত সুন্দর নাচেন!'

'হ্যাঁ, আমিও তাই দেখছি মা,' তানিয়া উত্তর দিলো। 'তিনি খুবই সুন্দর নাচেন।'

সে তার বাবার দিকে তাকাল। কিন্তু তার মন অন্য কোথাও। তার মনে হলো তার বাবার নাচ কিংবা এই পার্টির আনন্দ তার মনে কোনো ছাপ ফেলছে না। কিছুক্ষণ আগেও বাবাকে নিয়ে তিক্ত মধুর ভাবনা বয়ে চলেছিল তার মনে। কী হয়েছে তার? কলিয়া তার সমস্ত ভাবনা জুড়ে বসে আছে। কোথায় যেতে পারে সে? ঝেনিয়াদের বাড়ি নয় তো? ওরাও তো নববর্ষের পার্টির আয়োজন করেছে।

ফিল্কা ও তার ভাইয়েরা হাতে হাত রেখে নাচ শুরু করতেই তানিয়ার চিন্তারা যেন খেই হারিয়ে ফেলল। মৃদু ভঙ্গিতে দুলছে তারা, মেঝে থেকে তাদের পা প্রায় উঠছেই না, ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে তাদের বৃত্ত। জ্যোৎস্না রাতে তুগুর নদীর বালুচরে এই নাচ ইভেঙ্কদের মাঝে জনপ্রিয়।

ওরা তানিয়াকে ডাকতেই তানিয়া ছুটে যেয়ে ওদের নাচের বৃত্তে যোগ দিলো।

'অসাধারণ নৃত্য!' তানিয়ার বাবা অভিভূত হলেন। 'আমি জানি না ঠিক কবে এত আনন্দ করেছি! তানিয়া, তোমার মায়ের কাছ থেকে ওয়াইন চেয়ে নাও। আর তোমার জন্য একটা চমক আছে।'

'তুমি আগের মতোই পাগলাটে আছ!' তানিয়ার মা বলতে লাগলেন। 'তুমি জানো না ওদের ওয়াইন দেওয়া যাবে না?'

'আমি জানি স্পার্জ লরেল দেওয়া যাবে না,' তিনি বললেন, 'কিন্তু একটু আধটু ওয়াইন তো চলে।'

'এক চুমুক, এক চুমুক,' বাচ্চারা আবদার শুরু করল।

নানি ট্রেতে এক বোতল মিষ্টি ওয়াইন নিয়ে আসলেন। তার পিছুপিছু লাল ফৌজের তরুণ সৈনিক ফ্রোলভ চলে এলেন। পরনে তার মেষের চামড়ার কোট, আর হাতে একটা বালতি। আকর্ণবিস্তৃত হাসিতে উজ্জ্বল তার মুখ।

'ফ্রোলভ, বেটা আমার!' তানিয়ার বাবা বললেন। 'বাচ্চাদেরকে দেখাও কী এনেছ?'

বাচ্চারা সবাই দৌড়ে বালতির কাছে এসে উঁকি দিলো, কিন্তু হতাশ হয়ে পিছিয়ে গেল।

'বালতিতে বরফ ছাড়া কিচ্ছুটি নেই!' কেঁদে উঠল বাচ্চারা।

'খোকাখুকুরা, এত তাড়াহুড়ো নয়' ফ্রোলভ মজা পাচ্ছেন বাচ্চাদের কাণ্ডে। বালতি থেকে বরফের আস্তরণ সরিয়ে একটার পর একটা কমলা বের করতে লাগলেন তিনি। বাচ্চারা বিস্ময় আর আনন্দে হইচই করে উঠল।

বাচ্চারা কমলা কাড়াকাড়ি করে নিয়ে আবার ফেলে দিলো বালতিতে।

কমলাগুলো জমে এত হিমশীতল হয়ে আছে যে বাচ্চারা হাতে ধরে রাখতে পারল না। কমলাগুলোকে লাগছিল লোহারমতো শক্ত।

‘সোনামণিরা, দাঁড়াও একটু,’ তানিয়ার বাবা হাসতে হাসতে বললেন। ‘একটু উষ্ণ হলেই আগের মতো হয়ে যাবে কমলা। বিশ্বাস করো, তোমাদের ভালো লাগবে।’

তিনি একটা কমলা ধরে ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখতেই এটার গায়ে বরফের একটা পাতলা আবরণ রয়ে গেল কেবল। কমলাটাকে দেখতে লাগছিল ফার গাছে ঝোলানো কাচের গোলকের মতো। এরপরে তিনি ছুরি দিয়ে বরফের আস্তরণ ভাঙতেই হাতে পড়ে রইল একটা তরতাজা গোলাকার কমলা।

এটার রং আর ঘ্রাণ উত্তর দেশের লোকজনের কাছে বড্ড অদ্ভুত ও অপূর্ব লাগল। ফিল্কার ছোট্ট ভাইটি হাতে কমলা নিয়ে দ্বিধায় দাঁড়িয়ে আছে। সে খেতে ভয় পাচ্ছিল। ফিল্কা তার কমলা তার বাবার হাতে দিলো।

‘খেয়ে নে, বাছা,’ শিকারী বলে উঠলেন। ‘তোর বন্ধুরা তোকে দিয়েছে, নিশ্চয়ই খারাপ কিছু দেবে না। এটা যদি আরেকটু ছোট হতো, তাহলে তো এটাকে রোয়ান বেরি মনে করে আমার নতুন তামার পাইপটায় ঘষে নিতাম।’তিনি গর্ব করে বলতে লাগলেন, ‘আমাদের জঙ্গলে প্রচুর হয় রে এসব রোয়ান বেরি।’

কিন্তু তিনি নিজে কমলা খেলেন না। তিনি পুরোনো জমানার মানুষ, আগের ধ্যানধারণা নিয়ে চলেন। যা তার নিজের দেশের না, এসব ক্ষেত্রে তিনি সেসব এড়িয়ে চলেন।

ফিল্কা তার জ্যাকেটের পকেটে কমলাটা চালান করে দিলো। সে এটা তানিয়ার সাথে ভাগ করে খাবে। সে সবকিছুই তার সাথে ভাগ করে খায়–মিষ্টি মূল, সরস কাঠ, মধু, আর অবশ্যই পিঁপড়ের শরবত। কিন্তু তানিয়াকে দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। কোথায় গেল সে? কী হয়েছে তার?আজ তাকে খুব দুঃখী দুঃখী লাগছিল।

ফিল্কা পাশের ঘরে উঁকি দিলো। অন্ধকার ঘরে বিছানার ওপরে ওভারকোটগুলো ডাঁই করে রাখা, কিন্তু তানিয়া সেখানে নেই।

রান্নাঘরে তাকালে ফিল্কা দেখতে পেল তানিয়া বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার পশমি কোট পরে আছে, আর পায়ে নতুন পশমি জুতো পরে ফিতা বাঁধছিল।

ফিল্কা তাকে আড়াল করে দাঁড়াল। সে চাচ্ছিল না কেউ তাকে বাইরে যেতে দেখুক।

বারান্দায় এসে দাঁড়ায় তানিয়া। জমি থেকে উঠে আসা বাতাস হলকা রূপ নেয় তুলট মেঘে আর তা পাড়ি দেয় আকাশের আলোর রোশনাই। মেঘের আড়ে চাঁদ যেন দম-ফেলা ঘোলাটে আরশি।

তানিয়া আলতো পায়ে হেঁটে চলে যাতে পায়ের নিচের বরফে ফাটল না ধরে। চকমকে আর কুয়াশার মতো তুষারের গুঁড়ো ঝুরঝুর করে তানিয়ার গায়ে পড়ে, আর চুলে আঙুল চালিয়ে সে ঝেড়ে ফেলে বরফ। গেট পার হয়ে সে ঝেনিয়াদের বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় ওঠে। দূর থেকে দেখা যায় ঝেনিয়াদের বাড়ি তুষারপুঞ্জিতে ঢাকা। ওদের বাড়ি পৌঁছে তানিয়া বাড়ির চারপাশে জমা বরফের স্তূপের ওপর উবু হয়ে বসল। যদিও এভাবে অন্যের বাড়িতে উঁকি দিতে লজ্জা লাগছিল তার।



অনেকগুলো মোমবাতি দিয়ে ফার গাছ সাজানো হয়েছে। চাঁদের আলোর মতো মোমবাতির ঘোলাটে-সাদা আলো এসে রাস্তায় পড়ছিল। গাছের সামনে দেখা যায় চলমান মানুষের ছায়া। তানিয়া তাদের মাঝে কলিয়াকে খুঁজতে শুরু করল।

হিমেল কুয়াশায় তার মুখ লাল হয়ে গেছে। তবুও সে কলিয়াকে খুঁজে ফেরে। জানালার কাছে জলে ভেসে বেড়ায় কিছু ছায়া। এদের মধ্যে একটা ছায়া স্থির হয়ে আছে। আসলে এটা বড় একটা মাছ, গাঢ় তার ছায়া। হঠাৎ নড়েচড়ে উঠে মাছটা ভুস করে ওপরে উঠছে আর নামছে, নামছে আর উঠছে। এরপর আবার স্থির হয়ে গেল জলের তলানিতে। মাছটাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এমনকি এটার মুখনিঃসৃত বুদবুদও।

'কী হতে পারে এটা?' তানিয়া মনে মনে ভাবল। পুরোনো কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বুঝতে পারল এটা জানালার কাছে জলের বাটিতে রাখা ঝেনিয়ার গোল্ডফিশ।

অন্ধকারের মাঝ থেকে একজোড়া হাত এসে তুলে নিল জলের বাটিটা। মুহূর্তেই তানিয়াকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা জাদুময় দৃশ্য হারিয়ে গেল।

হঠাৎ দড়াম করে দরজাটা কে যেন বন্ধ করে দিলো। তানিয়া তড়িঘড়ি করে মাথা নিচু করে ফেলল যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। ধীরে ধীরে সে তুষারস্তূপের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে এক ছুটে রাস্তায় চলে এলো।

উদ্দেশ্যহীনভাবে তানিয়া দৌড়াতে লাগল যতক্ষণ-না তার সমস্ত অনুভূতি উবে যায়, আর রয়ে যায় একরাশ বিষণ্ণতা।

অনেকসময় পরে সে বাড়ির বাগানে ফিরে এলো। তার ইচ্ছে হচ্ছিল না বাড়ির মধ্যে ঢুকতে। বাগানে বার্চ গাছের পিছনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'কী হলো আমার?' সে ফিসফিস করে নিজেকেই জিজ্ঞেস করল। 'কী হয়েছে আমার? কেউ কিছু বলছ না কেন? বলো আমাকে?'

বার্চ গাছটি নীরব রইল, শুধুমাত্র হিমেল হাওয়ায় দুলে উঠে মর্মরধ্বনি বাজল দেওদার গাছের শাখায় শাখায়।

ফিল্কা বারান্দায় এসে মৃদুস্বরে তানিয়াকে ডাকল। কিন্তু তানিয়া উত্তর দিলো না। ফিল্কা গেটের কাছে দৌড়ে এসেরাস্তায় উঁকি দিলো। তানিয়াকে দেখতে না পেয়ে আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকল সে।

ফিল্কা বাড়ির মধ্যে যাওয়ার পরেই তানিয়া সাহস করে বার্চ গাছটির আড়াল থেকে বেরুল।

ঘরের মধ্যে বাচ্চারা এখনো নেচে চলছে। কলিয়া চেয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে পুড়ে শেষ হওয়া মোমবাতির জায়গায় নতুন মোমবাতি জ্বালাচ্ছিল। কলিয়াকে দেখেই তানিয়ার দম প্রায় বন্ধ হয়ে এলো, টলমল করতে লাগল তার পুরো শরীর। তুহিন কুয়াশায় তার চুল স্যাঁতসেতে হয়েছে আর পশমি কোট সাদা হয়ে গেছে বরফের আস্তরে।

'কোথায় গিয়েছিলে, তানিয়া?' তানিয়ার বাবা চিন্তিতমুখে জিজ্ঞেস করলেন।

'মাথা ঝিমঝিম করছিল। তাই বাইরে বের হয়েছিলাম।'

'তুমি বাইরে না যেয়ে আমার বিছানায় শুয়ে থাকতে পারতে,' তানিয়ার মা উপদেশের সুরে বললেন।

কলিয়া চেয়ার থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে তানিয়ার কাছে ছুটে এলো।

'শোনো, তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি। এক পরিচিত চীনা লোকের কাছ থেকে এনেছি। অনেক দূর থেকে বয়ে আনতে হয়েছে।'

প্রথমে সে একগাদা পোকার প্যাকেট রাখল তানিয়ার সামনে। বুনো বেরি ফলের চেয়েও লাল দেখতে এগুলো। তানিয়া প্যাকেটটা স্টোভের তাকে রাখল যেখানে কাঠ শুকানোর জন্য রাখা হয়েছে।

এরপরে কলিয়া একটা জলের বাটি দেখালো। বাটিতে একটা গোল্ডফিশ রাখা। মাছটা অনেক বড়, আর এটার লেজ লম্বা স্কার্টের মতো লাগছিল। জলের মধ্যে খাবি খাচ্ছিল মাছটা, তার আকারের তুলনায় জলের বাটিটা ছোট। জলে ভাসছিল ফার্নের পাতা।

'তোমার এত ঝক্কিঝামেলা করার দরকার ছিল না,' তানিয়া জিজ্ঞেস করল। 'আমি ঝেনিয়ার মতো নই। আমি জানালার কাছে মাছটাছ রাখি না। আমরা এটাকে ভেজে খাব।'

কলিয়া তার ভ্রুকুঁচকায়। তার চোখজোড়া গাঢ় আর দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি তানিয়া কী বলতে চাইছে। কিন্তু তার হাত অবশ হয়ে যাচ্ছিল। হাতে ধরা জলের বাটিটা দুলে উঠতেই মাছটা জলে লেজ ঝাপটাতে লাগল ক্রমাগত। মেঝেতেছিটকে পড়ল কয়েকফোঁটা জল।

দরজার কাছে সারা সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে ছিলেন নানি, আর তার কাছে যেয়ে কলিয়া অভিমানের সুরে বলল, 'নানুজান, তানিয়াকে এটা ভেজে দাও। সাথে কিছু আলুও ভেজে দিও। বড্ড ক্ষুধা লেগেছে ওর।'

'হ্যাঁ গো নানুজান, এটা ভেজে দাও। এটা খেতে বেশ লাগবে। কার্প মাছের মতোই লাগবে, এটা তো কার্প পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।'

সে তার বাবার কাছে এসে তার হাত ধরল।

'বাবা, তুমি আর আমি আজ অনেক নাচব। তুমি চমৎকার নাচতে পারো।'

সে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রাখল। নাচের তালেতার পদপাত পড়ল সারা মেঝেতে।

নাচের সময়ে তার মাথা কিছুটা পিছনে হেলে রাখল, আর যখন তার ক্লান্ত লাগে, তার কপাল ঝুঁকে তখন তার বাবার আস্তিনে রাখে। তার বাবা তানিয়ার হাত তুলে ধরে নেচে চলে, আর তানিয়া দোল খায় যেমন করে নদীর ঢেউয়ে দোলে ঘাসের বন। তার বাবা আজ তৃপ্ত। পিতৃসুখে পরিপূর্ণ যেন। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন বোধহয় তার এই উপহারের ডালি–অসাধারণ নাচ, হিমায়িত কমলা, বাচ্চাদের ওয়াইন খাওয়ার অনুমতি পাইয়ে দেওয়া সব বৃথা যাবে। কিন্তু না, তিনি তার প্রতিদান পেয়েছেন।

তানিয়ার মাকেও আজ বেশ ঝলমলে আর পরিপাটি লাগছে। তিনি অতিথিদের সাথে হাসিমুখে দেখাসাক্ষাৎ করছিলেন, কিন্তু তার আচরণ আড়ষ্ট মনে হচ্ছিল। তার মুখে মেকি হাসি ঝুলে আছে যেন। এমনকি তার কণ্ঠও বেশ আলাদা লাগছিল।

তানিয়া একে একে তার মায়ের সাথে নাচল, নাদিয়ার সাথে নাচল। সবশেষে যখন তার ক্লান্ত হয়ে পড়ল, ঘরের এক কোণে সাজানো ফার গাছের পিছনে বসে রইল।

ফিল্কা অভাগার মতো মুখ করে তানিয়ার কাছে এসে দাঁড়ায়। তানিয়া ফিল্কার কথা ভুলে গিয়েছিল, এমনকি সারাসন্ধ্যায় একটি কথাও তার সাথে বলেনি।

'আগামীকাল কলিয়ার সাথে কেউ একজন স্কেটিং রিঙ্কে যাবে,' ফিল্কা ধীরে ধীরে বলল।

'তুমি যাবে, তাই না?' তানিয়া বলল।

ফিল্কা মাথা নাড়ে।

'কে, তাহলে?'

'ঝেনিয়া।'

‘ওহ!’

তানিয়া কোনোরকমে গাছটিকে আঁকড়ে ধরল। গাছটি দুলে উঠতেই এটার ডালে ঝোলানো রুপালি কাচের গোলক মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল।

তানিয়া ভাঙা কাচের টুকরোর মাঝে দাঁড়িয়ে রইল।

‘কলিয়া আর কী বলতে বলেছে আমাকে?’

কিন্তু ফিল্কা দুঃখভরা চোখে তানিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

তার বাবা ও ভাইদের মতো তার বাদামি মুখ মোমবাতির আলোয় চকচক করছে।

‘আমি মোমবাতি খেতে পারি, জানো?’ ফিল্কা আচমকা বলে উঠল।

তানিয়া তার দিকে নীরবে তাকাল। ফিল্কার যেই কথা, সেই কাজ। সে জ্বলন্ত মোমবাতি ফার গাছ থেকে তুলে এনে ফুঁ দিয়ে আগুন নেভালো। এরপরে কচকচ করে মোমবাতিটা চিবাতে শুরু করল।

তানিয়ার সম্বিৎ ফিরে আসে।

‘কী করছ তুমি,ফিল্কা!’ চেঁচিয়ে উঠল তানিয়া। ‘অসুস্থ হয়ে পড়বে।’

‘না, কিচ্ছু হবে না আমার,’ ফিল্কা বলতে লাগল। ‘যদিও এটা সুস্বাদু নয়, তবুও এতে অসুস্থ হব না। মজা লাগছে না? বলো?’

আসলেই দৃশ্যটা মজার, আর তানিয়াকে হাসতেই হলো।

ফিল্কার চোখে অশ্রুজল ছোটছোট আলোকবিন্দুর মতো জ্বলজ্বল করে।

‘কেন তাকে দেখলে মনে হয় সে কাঁদছে?’ তানিয়া অবাক হয়েভাবল।

সে চারপাশে তাকাল, কিন্তু এমনকিছু দেখতে পেল না যাতে ফিল্কার কাঁদতে হয়। হয়তো-বা মোমবাতি খেতে বিশ্রী লাগে!

সে ফিল্কার হাত থেকে মোমবাতি টেনে বের করল।

‘তুমি নিজেকে অসুস্থ বানিয়ে ফেলবে, ফিল্কা,’ তানিয়া বলল। ‘আর আমি আগামীকাল সকালে তোমার সাথে স্কুলের কনসার্টে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তো বাচ্চাদের সামনে বাজে উদাহরণ তৈরি করে বসে আছ। তাকিয়ে দেখো।’

ওদের পাশে ফিল্কার এক ছোট ভাই এসে মোমবাতি কামড়াচ্ছে। তবে ফিল্কার মতো নয়, ও বেশ মজা নিয়েই কামড়াচ্ছে। তার ফোলা ফোলা দুই গালে যেন আনন্দ ধরে না। অন্য হাতে এখনো কমলাটা ধরে আছে।

****

পনেরো

মাঝরাতে একে একে সব অতিথি বিদায় নিল। তানিয়ার প্রিয় দুই বান্ধবী, ফিস্কা ও তার বাবা, তার নিজের বাবা, নাদিয়া আর বাকি সবাইকে তানিয়া বিদায়ী শুভেচ্ছা জানাল। কলিয়াকে বলল, 'শুভ নববর্ষ, কলিয়া! সুখী হও, আর এসব তুচ্ছ ব্যাপারগুলো ভুলে যেও।'

তানিয়া সিদ্ধান্ত নিল তার বিষয়ে আর ভাববে না।

মাঝরাতে মশাদের গুনগুন শব্দে তানিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। তার মনে পড়ল আগের দিন রাতে স্টোভের তাকে একগাদা পোকার প্যাকেট রেখেছিল। সেখানে হয়তো উষ্ণতা পেয়েমশার ডিম ফুটে শূককীট বেরিয়েছে। ওটাই এখন হয়তো গুনগুনিয়ে চলেছে,কিংবা হতে পারে পরিণতমশা। প্রচণ্ড শীতের এই মাঝরাতে মশার গুনগুন শব্দ শোনাও আতঙ্কের বিষয়!

তানিয়া উঠে বসে মশার একটানা গুনগুন শব্দ শুনতে শুনতে চারপাশের অন্ধকারের দিকে তাকায়। নৈশপ্রহরীর ঝুমঝুমির মতো তার বুকে ধুকপুকানি বাজে।

মশার এই গুনগুন সুরে কেন ভয় পেল সে?

'আমি এটাকে মেরে ফেলব,' সে ভাবল।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মশার গুনগুন শব্দ আর শোনা গেল না। তাই তানিয়াকেকিছু করতে হলো না।

তানিয়া আবার শুয়ে পড়তেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। সকালবেলায় ঘুম ভাঙল তার। একটা ভালো ঘুমের পরে তাকে বেশ ঝরঝরে ও সতেজ লাগছে।

তার মা ইতোমধ্যে হাসপাতালে চলে গেছেন। তবুও তার মনে একাকিত্বের বেদনা স্পর্শ করল না। হৃদয় যেন তার কানায় কানায় পূর্ণ আজ। শরীরও লাগছিল পালকের মতো হালকা।

'কেন আমার এমন লাগছে?' সে নিজেকে জিজ্ঞেস করল।

'আজ ছুটি, তাই? নাকি আমি প্রেমে পড়েছি? ঝেনিয়া সবসময় প্রেম-ভালোবাসার কথা বলে। লজ্জা নেই মেয়েটার। আচ্ছা, বেশ, আমারও প্রেমে পড়তে আপত্তি নেই। আজকের পার্টিতে আমি কলিয়ার সাথে নাচব। স্কেটিং রিঙ্কেও যাব ওকেআর ঝেনিয়ার স্কেটিং দেখতে। আমি ওদের সামনে যাব না, তুষারপুঞ্জির পিছনে লুকিয়ে থাকব। তার স্কেটসের ফিতা খুলে গেলে আমি বেঁধে দেব। হ্যাঁ, আমার নিজের হাতে ওর স্কেটসের ফিতা বেঁধে দেব।

সকালবেলায় যখন হাতমুখ ধুয়ে প্রাতরাশ সারছিল, মাথায় ঘুরছিল তখন এসব চিন্তা।

চোখ তার চকচক করে উঠল, তার মনে হচ্ছিল প্রতিটি ভঙ্গি সতেজতায় পূর্ণ।

সে স্কেটসজোড়া ঝেড়েমুছে তার ফিতা ভালোভাবে এঁটে নিল, আর টাইগারের দিকে ছুড়ে দিলোএকটুকরো মিঠাই। সে টাইগারকে ডাকল তার পিছুপিছু।

টাইগার বরফের মাঝে মিঠাইয়ের ঘ্রাণ শুঁকতে লাগল। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় অকেজো হয়ে যাওয়ায় মিঠাইয়ের আশা ছেড়ে দিতে হলো তাকে। যদিও সে এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় বেরুল, তার মতো বুড়ো ও মোটাবুদ্ধি তানিয়ার কোনো কাজে আসবে না, কিছুটা সময় পরে বুঝতে পারল–বৃথাই এই আত্মত্যাগ।

তারা ঘণ্টাখানেক তুষারপুঞ্জির পিছনে লুকিয়ে রইল, কিন্তু তারা কাউকে দেখে পেল না। শুধু দেখতে পেল নদীর তীরে ধু-ধু বরফের রাশি। মনে হচ্ছিল এক অজানা আতঙ্ক ওত পেতে আছে।

দূরে সবুজ-বীথিময় শৈলান্তরীপে দূরন্ত হাওয়া বয়, আর শোঁ-শোঁ শব্দ ভেসে আসে তুষারাবৃত শিলার চূড়া থেকে।

দীর্ঘক্ষণ তানিয়া ও তার কুকুর দাঁড়িয়ে রইল, এরপরে ফেরার উদ্দেশ্য পা বাড়ায়।

জেলেদের কুঁড়েঘরগুলোর পিছনে পথের যেখানে ঢাল শুরু, সেখানে কলিয়াকে দেখতে পেল তানিয়া। ঝেনিয়াও তার সাথে আছে। বরফে ঢাকা ঢালু পথ বেয়ে ঝেনিয়াকে নামতে সাহায্য করছিল কলিয়া। জেলেদের ছেলেপুলেরা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে পিচ্ছিল বানিয়ে রেখেছে ঢালু পথটা। কলিয়া আর ঝেনিয়া দুইজনেই কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে ওদের স্কেটসজোড়া।

তানিয়া পাশের রাস্তা ধরল। রাস্তার পাশে জমা তুষার স্তূপে তার স্কেটসজোড়া লুকিয়ে রেখে একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। টাইগার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল এসব। বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে!

কলিয়া তাদের ছাড়িয়ে চলে গেল, কিন্তু তানিয়া নড়ল না। টাইগার গরগর করে উঠল আর তার থাবা কাঁপতে লাগল। কলিয়া তাকে বারান্দায় মুরগির হাড় এনে দিত, আর সেই খাবারের সুঘ্রাণের স্মৃতি মনে পড়ছে তার।

সে তার লুকানোর জায়গা থেকে ছুটে যেয়ে কলিয়ার সামনে বসে পড়ল। বিস্মিত হলো কলিয়া।

'তুমি এখানে, টাইগার?' সে বলল। 'তানিয়া কোথায়?'

তানিয়াও সেখানে ছিল। সে বাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে এসে কলিয়ার সামনে দাঁড়াল। লুকিয়ে থাকার মানে হয় না আর। তার গালদুটো গরম হয়ে উঠল, আর এত লাল হয়ে গেল যেন সেহিমেল পুবালি হাওয়ায় সারা সকাল কাটিয়েছে।

'আয় টাইগার, চলে আয়,' তানিয়া ডাকল টাইগারকে।

কলিয়া কাঁধে স্কেটস দুলিয়ে তানিয়াকে হাত নাড়ল।

'তো স্কেটিং করতে বের হয়েছ?' কলিয়া বলল। 'আর আমি ভাবছিলাম তুমি ফিল্কার সাথে কনসার্টে আছ।'

তানিয়া না নড়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সে কঠোর স্বরে কথা বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না।

'আমি মোটেও স্কেটিংকরছিলাম না,' তানিয়া জেদ নিয়ে বলল। 'দেখতে পাচ্ছ না আমার সাথে স্কেটস নেই। আর, হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আমি আর ফিল্কা স্কুলের কনসার্টে একসাথে যাচ্ছি।'

কলিয়া তানিয়ার হাতের দিকে তাকাল। স্কেটস নেই তানিয়ার হাতে।

'বাহ! তাহলে সত্যিই যাচ্ছ! বেশ! টাইগার, এসো আমার সাথে।'

'যাস নে, টাইগার!' তানিয়া চেঁচিয়ে উঠল। আর বুড়ো কুকুরটা মুরগির হাড়ের লোভে দোনামনা করতে লাগল কোনদিকে যাবে সে।

অবশেষে টাইগার তানিয়ার পাশে বসে পড়ল। হয়তো বসে বসে ভাবছে তার দুর্দশার কথা। আচমকা উঠে পড়ে এমনভাবে দৌড়াল, যেন জরুরি কিছু মনে পড়েছে তার। তানিয়া কলিয়ার দিকে না তাকিয়ে টাইগারের পিছন পিছন ছুটল।

‘আমি আর কলিয়ার কাছ থেকে লুকাব না,’ তানিয়া ভাবল।

‘তার স্কেটসের ফিতাও বেঁধে দেব না। এসবের কোনো অর্থ নেই।’

সে প্রতিজ্ঞা করল কলিয়াকে নিয়ে আর ভাববে না। তার ইচ্ছে হচ্ছে কলিয়ার সমস্ত স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে।

তার মানে এই নয় যে, সব আনন্দের স্মৃতি হারিয়ে যাবে, এর চেয়েও বড়বড়আনন্দের স্মৃতি তার মনে গেঁথে আছে।

এইসব আনন্দের সাথে পরিচয় তো এই কিছুদিনের মধ্যেই হলো। খুবই সাধারণ তবে আনন্দের! নদীতে ট্রাউট মাছ ধরা, বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে নাম ডাকার সময়ে বিউগলের বাজনা শোনা, আরও কত কী! তার যে কত ভালো ভালো বন্ধু আছে! এমনকি ফিল্কা নিশ্চয়ই এখনো তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আরও অনেকে হয়তোস্কুলের গেটে উঁকি দিচ্ছে ওর জন্য।

কত সময় সে পার করেছে অলসতায়, ভেবে ভেবে, আনমনে রাস্তায় বেরিয়েছে কখনো, কখনো-বা এই শহর আবিষ্কার করতে চেয়েছে নিজের মতো করে, এই শহরেই যে তার জন্ম। এ সবই আনন্দের!

ছবির মতো ছোট্ট সুন্দর এই শহরটাবন-পাহাড়ের মিতালি। মাথার ওপরে আছে বিশাল আকাশ। বসন্তকালে এই শহরের রূপে মুগ্ধ হয়ে শূন্যে পাক খেয়ে উড়ে বেড়ায় ঈগল পাখি। এমনকি এই শীতকালেও কী কম সুন্দর! এই শহরের সব বাড়িই কাঠের নয়, যেমন–স্কুল ঘর, নতুন একটা কারখানা যেখানে স্বর্গের ঘ্রাণ পাওয়া যায়, আর আছে শহরের বাঁধ। এই তিনটে স্থাপনা পাথরের তৈরি। এই শহরের সবগুলো সড়কই আনকোরা, বন চিরে বেরিয়েছে সড়কগুলো। এই গহন অরণ্যের সব সড়কে দিন-রাত ছুটে চলে মোটরগাড়ি, আর সিডার গাছের চূড়া ছুঁয়ে পাকিয়ে ওঠে ইঞ্জিনের ধোঁয়া। ব্যস্ত এই সড়কগুলোতে যানজট লেগেই থাকে, আর মোটরগাড়ির চাকায় চেইন লাগানো থাকে যাতে বরফে পিছলে না যায়।

এই শহরে এক বুড়ো টিনমিস্ত্রী আছেন যিনি বাড়ি বাড়ি, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলেন, ‘হাঁড়ি-পাতিল, রাং-ঝালাই! হাঁড়ি-পাতিল, রাং ঝালাই!’

বসন্তকালে তিনি ভারী ধাতব পাত কাঁধে নিয়ে বের হন, কিন্তু শীতকালেবড্ড সুবিধে। ধাতব পাতের সাথে দড়ি বেঁধে বরফের ওপর দিয়ে সারা শহর টেনে টেনে চলেন, দেখলে মনে হয় পোষা কুকুরছানা নিয়ে বেরিয়েছেন।

এই পিচ্ছিল বরফ কারও জন্য সুবিধার, কারও জন্য অসুবিধার। আর এই চিরাচরিত প্রকৃতি নিয়ে কিছু বলার নেই।

তানিয়া এই বুড়ো টিনমিস্ত্রীকে দেখল ধাতব পাত টেনে টেনে চলছিলেন। সে দ্রুতপায়ে হেঁটে স্কুলেএলো।

স্কুলের গেট আধভেজানো ছিল। অবাক করার বিষয় হলো, তানিয়ার সহপাঠীরা সবাই সড়কে এসে ভিড় করে আছে। তানিয়াকে দেখে ওরা চেঁচিয়ে কী যেন বলতে বলতে তার দিকে ছুটে আসছিল, কিন্তু তানিয়া বুঝতে পারছিল না ওরা কী বলতে চাচ্ছে।

‘তুষাড় ঝড় আসছে! তুষাড় ঝড়!’ ওরা চিৎকার করছে। ‘কোনো কনসার্ট হবে না।’

ছোটছোট বাচ্চাদের বাবা-মায়েরা ওদের বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছে।

দুইটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে নিয়ে আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা গেট থেকে বেরুলেন। ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে কোথাও যেতে রাজি নয়, আর পাশের মেয়েটি বেশ চঞ্চলা।

তানিয়া ওদেরকে দেখার পরে সে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশটা যেন নীল আর কালো দুই ভাগে আলাদা হয়ে গেছে।কালো মেঘে ঢাকা আকাশকে দুর্ভেদ্য দেয়াল মনে হচ্ছিল। ঝোড়ো হাওয়ায় বুরুজের নিশান পতপত করে উড়ছে।

শহরের ওপর দিয়ে তুষারঝড়ের ঘনঘটা আরম্ভ হয়ে গেছে, শুধু বর্ষণ বাকি তার।

তানিয়া তার হাতের আঙুলগুলো গোল করে পাকিয়ে এর মাঝ দিয়ে আকাশ দেখতে লাগল। কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে পুরো আকাশটা।

'আর মিনিটখানেকের মধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ছি আমরা। আর ওরা এখনো নদীতে,' তানিয়া ভাবতে ভাবতে আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

'তুষারঝড় শুরু হয়ে যাবে, তানিয়া!' আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা চিৎকার করলেন। 'এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যাও, আর যার সাথেই দেখা হবে, তাকে এ কথাটাই বলবে।'

কিন্তু তানিয়া বাড়ি ফিরে গেল না।

'আমি তুষারঝড় ভয় পাই না,' তানিয়া বলতে লাগল। 'আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। এই বাচ্চা মেয়েটাকে আমি ওদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।'

'ও অনেক দূরে থাকে, তানিয়া। নদীর কাছে।'

'সবকিছু ঠিক আছে,আমি জানি ওর বাড়ি কোথায়।'

'ঠিক আছে, তাহলে। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পারো, ফিরে এসো।'

'আমার কিছু হবে না।'তানিয়া তাকে আশ্বস্ত করে। 'দুশ্চিন্তা করবেন না, আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা।'

সে মেয়েটির হাত ধরে রওনা হলো। বেলা এখন দ্বিপ্রহর। এর মধ্যেই আশেপাশের বাড়ির গৃহকর্ত্রীরা দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে ঘরে বাতিজ্বালিয়েছে।

রাস্তার মোড় পর্যন্ত না থেমে মেয়েদুটি জোরে জোরে দৌড়াতে লাগল।পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে চূড়ায় এসে থামল ওরা, তাকিয়ে দেখল চারপাশ। নদীর অস্তিত্ব আর বোঝা যাচ্ছে না। কেবল চরাচর জুড়ে শুভ্র তুষার, কয়েকটা বজরা নৌকা অর্ধেক গেড়ে আছে তুষারের মাঝে। ওদের ডানদিকে স্কেটিং রিঙ্ক। দেওদার গাছের মঞ্জরি রিঙ্কের চারপাশে ঝুলে আছে যেন এঁকে দিয়েছে সীমানা। মাঝদরিয়ায় ঝড়ের কবলে পড়া জাহাজের মতো দুলে ওঠে মঞ্জরি। রিঙ্ক ছাড়িয়ে বহুদূরে, নদী ও ন্যাড়া পাহাড়ের ওপরে তুষারশুভ্র ঘূর্ণিঝড়ের নাচন আরম্ভ হয়। জনমানবহীন রিঙ্কে কেবল দুইজনকে দেখা যাচ্ছে হাত ধরাধরি করে স্কেটিং করতে।

নদীতীর ঘেঁষে ঢালু পথটায় নামতে নামতে তানিয়া একবার রিঙ্কের দিকে তাকায়, আরেকবার মেয়েটির দিকে তাকায়।

ছোট্ট মেয়েটির হাঁপ ধরে গেছে। দম নেওয়ার জন্য থামল।

'ওরা দুইজন তো আমাদের স্কুলের। ওদের ডাকছ না কেন তুমি?' বাচ্চা মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু তানিয়া উত্তর না দিয়ে মেয়েটির হাত টেনে তার বুকের ওপর রাখল।

'শুনতে পাচ্ছিস কিছু?' তানিয়া জিজ্ঞেস করল।

'না গো, কান মনে হয় জমে গেছে। কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না,' ছোট্ট মেয়েটি উত্তর দিলো। 'তুষারঝড় তো শুরু হচ্ছে, ওরা এখনো স্কেটিং করেছে, কেন তুমি ওদের সতর্ক করছ না?'

কিন্তু তানিয়া এবারও কোনো উত্তর দিলো না। ওকে হাত ধরে মেয়েটির বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নদীর তীরে দাঁড়াল।

তানিয়া হেঁটে হেঁটে বজরা-নৌকা ছাড়িয়ে যেখানে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায়, সেই পর্যন্ত গিয়ে থামল। সে বুঝতে পারল রাশি রাশি বরফের মাঝে দ্রুত হাঁটা যাবে না। তাই যাই হোক-না-কেন সে কোনো তাড়াহুড়ো করবে না। তুষারঝড়ে যদি সে অন্ধও হয়ে যায় কিংবা রিঙ্ক ও নদী যদি বরফে চাপা পড়ে যায়, তবুও সে তাড়াহুড়ো করবে না। সে যা করবে তা হলো–স্কেটিংরত দুইজনের কাছে যেয়ে বলবে, 'তোমাদের বুদ্ধিসুদ্ধি কি আর হবে? জলদি বাড়ি ফিরে যাও। কিন্তু ভেবো না আমি তোমাদের জন্যেই এসেছি। আমি একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে গেছিলাম। তোমাদের সাথে পথে দেখা হলো, এই যা! তোমাদের ভাগ্য ভালো বলতে হয়, কেননা, ঝড়ের আগে আগে এই নদীতে হাঁটতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। তোমরা যদি বিশ্বাস করতে না চাও তো, করবে না। আমি আস্তে আস্তে হেঁটে এখানে এসেছি, আবার আস্তে আস্তে হেঁটেই চলে যাব। আমার অত তাড়াহুড়ো ভালো লাগে না...'

তানিয়া বিড়বিড় করতে করতে আনমনে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলল। হিমেল হাওয়ায় কান তব্দা দেয়, বরফে ডুবে যাওয়া বজরা-নৌকা ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে গেছে সে। রিঙ্কে যাওয়ার ছোট পথটা ধরল। হঠাৎ থমকে গেল সে, কাউকে দেখা যাচ্ছে না রিঙ্কে। সে নদী ও নদীর পারে দৃষ্টি ঘুরাল। সবকিছুই ঢেকে গেছে গাঢ় কুয়াশায়। আচমকাই সে খেয়াল করল, তার পায়ের কাছে কলিয়া। বড়সড়ো একটা বরফের চাইয়ের ওপরে বসে আছে। আশেপাশে ঝড়ে ভেঙে পড়া দেওদার মঞ্জরি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঝেনিয়াও তার পাশে বসে আছে। মাথার ওপরে বিশাল সূর্যকেও যেন গ্রাস করে ফেলল দিগন্তবিস্তৃত কুয়াশা।

দেওদার গাছের ডাল হাতে নিয়ে মটমট করে ভাঙতে ভাঙতে তানিয়া কলিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'অন্ধ হয়ে গেছে নাকি তোমরা?' ঝেনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল তানিয়া। 'তুষারঝড় শুরু হবে, আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন।'

এসব বলতে বলতে তানিয়া খেয়াল করল ঝেনিয়া প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। তার ফোলা গালদুটো লাল হয়ে গেছে। কাঁপতে লাগল থরথর করে।

'কী হয়েছে?' সতর্ক চাউনিতে জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'সব দোষ কলিয়ার,' ঝেনিয়া কাঁপা কাঁপা স্বরে বলতে লাগল। 'কলিয়া আমাকে জোর করে স্কেটিং করতে নিয়ে এসেছে। আমার ভয় করছে। কী জোরালো বাতাস!'

'মিথ্যে বলিস না,' কলিয়া বলল। 'এটা তোর বুদ্ধি,আজ সকালে স্কেটিং করতে আসার ইচ্ছেটা কার ছিল শুনি?'

'তুই নিয়ে আসিসনি? তাহলে কে ফিল্কাকে বলল আমরা স্কেটিং-এ যাচ্ছি সেটা তানিয়াকে শুনাতে।'ঝেনিয়া পালটা যুক্তি দিলো।

তানিয়াআতঙ্কিত চোখে কলিয়াকে ঝুঁকে দেখতে লাগল। ঝেনিয়ার কোনো কথাই তার কানে যাচ্ছে না।

কলিয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, আর এক হাত দিয়ে তার পা খামচে ধরে আছে। ব্যথায় কুঁকড়ে উঠছে সে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না নিজে নিজে উঠে দাঁড়াতে পারবে।

'চলে যা বুদ্ধু, চলে যা,' ঝেনিয়াকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল কলিয়া। 'তোদের কাউকে আমার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি এখানে একাই থাকব।'

প্রচণ্ড শীতে ঝেনিয়া কাঁপতে লাগল।

'আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি,' ঝেনিয়া ঘোষণা দিলো।

তানিয়া ঝেনিয়ার কাঁধ ধরে শহরের দিকে ঘুরিয়ে দিলো।

‘আচ্ছা, যা। কিন্তু ফিল্কার বাসা হয়ে যাস, প্লিজ। ওকে বলিস, আমরা এখানে। আমার মা বাড়িতে নেই,’ তানিয়া বলল।

‘উঁহু, আমি যাচ্ছি না। আমি সোজা বাসায় যাব। আমার ভয় করছে। যেকোনো মুহূর্তে ঝড় শুরু হয়ে যাবে।’

ঝড়ের ঝাপটা থেকে বাঁচতে ঝেনিয়া তার কোটের আস্তিনে মুখ ঢেকে পাহাড়ি পথ বেয়ে হোঁচট খেতে খেতে চলল।

তানিয়া কলিয়ার সামনে উবু হয়ে বসে তার স্কেটসের ফিতা খুলতে লাগল।

‘ব্যথা লেগেছে? বেশি যন্ত্রণা করছে না তো?’ তানিয়ার কণ্ঠে দরদ ঝরে।

কলিয়া কোনো উত্তর দিলো না।

হঠাৎ করেই চারপাশ অন্ধকার হয়ে এসে গ্রাস করে নিল নদী আর আকাশকে।

তানিয়ার আঙুল ঠান্ডায় শক্ত হয়ে যাচ্ছিল, তাই কিছুক্ষণ পরপর সে তার হাঁটুর মাঝে আঙুল রেখে গরম করার চেষ্টা করছিল। কলিয়া ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে রইল। তানিয়া তার দিকে হাত বাড়াতেই কলিয়া তার হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পারল না সে, তুষার স্তূপে ডুবে গেল তার পা।

‘তোমার পা কি ভেঙে গেছে?’ তানিয়া ভয়ে শিউরে উঠল।

‘মনে হচ্ছে না। কিন্তু পা মচকে গেছে সম্ভবত। বোকা ঝেনিয়া স্কেটিং করতে জানে না।’

অপ্রত্যাশিতভাবে কলিয়া এই পরিস্থিতিতেও হেসে উঠল।

‘ও কি আমায় নিয়ে হাসছে?’ তানিয়া ভেবে ভেবে অবাক হয়। কারণ, সে কলিয়াকে নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। হয়তো কলিয়া গুল মারছে, আদতে কিছুই হয়নি ওর।

‘দ্যাখো,’ কলিয়া হাসতে হাসতে রাস্তার দিকে আঙুল তুলে বলতে লাগল। ‘ঐ যে টাইগার, ও মুখে করে তোমার স্কেটস নিয়ে আসছে। আমি জানতাম তুমি কোথাও হয়তো স্কেটস লুকিয়ে রেখেছ।’

তানিয়া রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল টাইগার ফিতা কামড়ে ধরে স্কেটস টেনে টেনে নিয়ে আসছে।’

টাইগার তানিয়ার কাছে এসে তার পায়ের কাছে স্কেটসজোড়া ফেলল, আর অপেক্ষা করতে লাগল তার আদরের জন্য।

তানিয়া তার প্রায় অবশ হয়ে আসা আঙুলগুলো টাইগারের লোমে বুলিয়ে দিলো। ও নিশ্চয়ই ঐ বাড়িটির পিছনে তুষার স্তূপে লুকিয়ে রাখা স্কেটসজোড়া টেনে বের করেছে, চলতি পথে লোকজনের থেকে আড়াল করে, হিমশীতল বাতাসের ঝাপটা সয়ে এতদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে তানিয়াকে স্কেটসজোড়া দেওয়ার জন্য।

কতটা কষ্ট করেছে টাইগার! কিন্তু তার কষ্ট বৃথা গেল। স্কেটসজোড়া দিয়ে এখন কী হবে আর!

‘আমি কীই-বা করতে পারি?’ তানিয়া অসহায়ের মতো তাকাল। ‘আমাদের কাছে শুধু টাইগার আছে। আর তুমি হাঁটতেও পারছ না। অন্তত জেলেদের কুঁড়েঘর পর্যন্ত তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। তুমি এখানে থাকতে পারবে না। তুমি জানো না আমাদের এখানে ঝড় কতটা ভয়াবহ!’

‘আমি তোমাদের ঝড়ে ভীত নই,’ কলিয়া একগুঁয়ে সুরে বলল। ‘তুমি যদি ভেবে থাক, আমি তোমাদের নদী ভয় পাই কিনা, যেমন করে বিড়ালছানা নদীতে পড়ে গিয়েছিল, সেটা তোমার ব্যাপার। তোমার যা খুশি আমাকে নিয়ে ভাবতে পারো। আর তুমি যদি ভয় পেয়ে থাকো, তবে চলে যেতে পারো।’

‘না,’ তানিয়া বলল। ‘আমি ঝড়ে ভীত নই। কিন্তু তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আমি জানি ঝড় কতটা বিপদজনক। আর আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।’

তানিয়া তার দিকে আবেগময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, সেই দৃষ্টি লুকানোর কোনো চেষ্টা করল না।

বেদনাহত মুখে তানিয়া তার পাশে বসল।

কলিয়া মাথা নিচু করে বসে রইল।

‘অনেক আগেই আমার বাড়িতে যাওয়া উচিত ছিল। আমি বাবাকে কথা দিয়েছিলাম যে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব। উনি জানেন না আমি কোথায় আছি।’

‘আমি কীই-বা করতে পারি?’ তানিয়া আবার বলল। কলিয়ার থেকে মুখ ফিরিয়ে সে বিষণ্ন চোখে টাইগারের দিকে তাকাল। টাইগারের সারা শরীর কাঁপছে।

আকাশ যেন হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের কাছে নেমে এলো, আর গিরিসংকটে ধোঁয়ার মতো ভাসতে লাগল। চারপাশের আঁধার ক্রমশই নিকটে চলে এলো। কিন্তু এখনো বালুময় শৈলশিলার পিছন থেকে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়নি, তুষারপাতও আরম্ভ হয়নি। ঝড়ের জন্য ক্ষণ গুনতে লাগল ওরা।

‘আমাদের হাতে হয়তো এখনো কিছু সময় আছে,’ তানিয়া বলল। ‘ফিল্কার একপাল কুকুর আছে, আর আমি ওদের ভালো চালাতে পারি। আমি যাব। যেতেই হবে। ঝড় নামার আগেই সবকিছু করতে পারব আমরা। আমার জন্য এখানেই অপেক্ষা করো, আমি তোমায় নিরাপদে বাড়ি নিয়ে যাব। ভয় পেয়ো না। টাইগার তো রইলই। ও তোমাকে ছেড়ে যাবে না।’

তুষারস্তূপে বসে ছিল টাইগার। তানিয়া হাত বাড়িয়ে দিতেই তার হাত চাটতে লাগল টাইগার। তারপরে তানিয়া বেরুল। কলিয়া যেখানে ছিল, সেখানেই বসে রইল। শঙ্কাপূর্ণ চোখে দেখতে লাগল ঝোড়ো বাতাস কেমন করে পাহাড়ের ওপরের গাছগুলোকে নাড়িয়ে দিচ্ছে।

তানিয়া বাঁধের দিকে ছুটল। মাথা নিচু করে কুঁজোপানা হয়ে ছুটছে, ঝোড়ো হাওয়া কাঁপুনি দিচ্ছে তাকে। সড়কে জমা তুষারস্তূপের ওপর দিয়ে ছুটছে।

আশেপাশের সব বাড়ির দরজা বন্ধ, শুধুমাত্র ফিল্কার বাড়ির দরজা ছিল আধ-ভেজানো। ফিল্কা তার বাবাকে নিয়ে কুকুরে টানা স্লেজে চেপে কেবল বাড়িতে পৌঁছেছে আর বারান্দায় বসে ফিল্কা তার স্কি থেকে বরফ সাফ করে নিচ্ছিল। তানিয়াকে দেখে ফিল্কা ভীষণ অবাক হলো। স্লেজ থেকে এখনো কুকুরদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি আর ওরা সব উঠোনে শুয়ে আছে। অ্যাশ কাঠের ছড়ি ‘কাইউর’ পড়ে আছে স্লেজের পাশে।

তানিয়া কাইউর হাতে নিয়ে উঠে পড়ল স্লেজে।

‘আরে, কী করছ তানিয়া?’ফিল্কা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল। ‘সাবধান! কুকুরগুলো কিন্তু খুব হিংস্র।’

‘আমি জানি,’ তানিয়া বলল। ‘আমি জানি, প্রিয় ফিল্কা। কিন্তু কলিয়াকে বাড়ি নিয়ে যেতে স্লেজটা দরকার। ও পা মচকে রিঙ্কে পড়ে আছে। আমি তোমার কুকুরদের ফিরিয়ে নিয়ে আসব। বেশি দূর নয় তো।’

তানিয়া কাইউর হাতে নিয়ে নানাই ভাষায় কুকুরদের ডাকল। কুকুরগুলো উঠে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

এরমধ্যেই ফিল্কা স্কি পরেবারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নামল। ততক্ষণে স্লেজ চলে গেছে বহুদূরে। কিন্তু সে স্কি করে দৌড়ে চলল আর চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘ঝড় শুরু হচ্ছে! কোথায় যাচ্ছ? আমার জন্য দাঁড়াও একটু।’

তার চিৎকার তানিয়ার অব্দি পৌঁছাল না।

সত্যিকারের শিকারীর মতো স্লেজে ছুটতে লাগল তানিয়া। কাইউর হাতে স্লেজকে দক্ষভাবে চালনা করছে। যদিও তার কণ্ঠ কুকুরদের কাছে অচেনা, তবুও ওরা তানিয়াকে মান্য করছে।

ফিল্কা স্কি থামিয়ে দাঁড়ায়। হিমেল হাওয়া তার কাঁধে সুঁইয়ের মতো বিঁধছে। তবুও সে ফিরে এলো না। সে কুঁজো হয়ে স্কি করছিল, আর শুধু ভেবে চলল ঝড়ের কথা, তানিয়ার কথা আর তার কথা। অবশেষে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে সবেগে ছুটল দূর্গের দিকে। তার চোখেমুখে ঝাপটা দিচ্ছে ঝড়ের তীব্র হাওয়া।

কলিয়ার কাছাকাছি পৌছাতেই তানিয়া স্লেজের রানারগুলোর মাঝে কাইউর ঠেসে ধরল তুষারস্তূপের মধ্যে। কুকুরগুলো থমকে দাঁড়াতেই স্লেজগাড়ি থেমে গেল নির্বিঘ্নে।

শারীরিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও কলিয়া হাসল। টলমল পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল সে। জীবনে এই প্রথমবারের মতো কুকুরে টানা স্লেজগাড়ি দেখে ঠান্ডায় টকটকে লাল হয়ে যাওয়া কালিয়ার মুখে বিস্ময় আর হাসি ফুটে উঠল।

‘বুদ্ধিটা খারাপ না,’ কলিয়া তিমির হাড় দিয়ে বাঁধানো স্লেজগাড়ির আড়ম্বরে অভিভূত হলো। লেজছাটা কুকুরগুলো শুয়ে শুয়ে বরফ চাটতে লাগল।

‘কুকুরগুলো তো ফিল্কার মতো বদরাগী নয়। দেখতেও তো তেমন শক্তিশালী মনে হয় না। ওরা কেবল আমাদের পমেরানিয়ান জাতের কুকুরের চেয়ে আকারে কিছুটা বড়,’ কলিয়া বলল।

কিন্তু তানিয়া জানে এরা কতটা বদরাগী, এদের চালনা করা কতটা কঠিন। এরা সবসময় মুক্ত থাকতে চায়, স্লেজ বইবার চেয়ে স্লেজের বাইরে থাকতেই বেশি পছন্দ এদের।

কলিয়া তানিয়ার কাঁধে ভর দিয়ে স্লেজে উঠে পড়ল। টাইগার ভয়ে কাঁপছিল, ওকে বুকে চেপে ধরে তানিয়াও স্লেজে উঠে পড়ল। তানিয়া আবারও নানাই ভাষায় ডাক দিলো কুকুরদের। তার দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির, ঝোড়ো হাওয়ায় তুষারের গুঁড়ো ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে। কিন্তু তানিয়া কলিয়ার দিকে তাকাতেই লাজুক হয়ে উঠল তার মুখখানা।

‘ব্যথা কি খুব বেশি হচ্ছে?’ তানিয়া জিজ্ঞেস করল। ‘আমরা শিগগিরই বাড়ি ফিরতে পারব যদি না আমরা ঝড়ের কবলে পড়ি।’

কলিয়া অবাক হয়ে দেখতে লাগল সবকিছু। সে তানিয়ার চোখজোড়ার দিকে তাকাল। তুষারকণায় ঢেকে গেছে তানিয়ার চোখের পাপড়ি, চোখে পড়ে আছে দুশ্চিন্তার ছাপ যা এর আগে কখনো দেখতে পায়নি কলিয়া। তানিয়ার মাঝে নতুন, অচেনা কিন্তু আলাদা এমনকিছু তৈরি হয়েছে, যা কলিয়া তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বুঝতে পারল।

সাদা সাদা মেঘের মতো বরফ পড়ছে তাদের গাল ছুঁয়ে, আর মনে হচ্ছিল একপাল বুনো কুকুরেরা স্লেজে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের এমন এক রূপকথার রাজ্যে যার কথা কখনো শোনেনি সে।

স্লেজটা কীসের সাথে যেন ধাক্কা খেল, সাথে সাথেই কলিয়া তানিয়ার কোট চেপে ধরল, নাহলে হয়তো সে স্লেজ থেকে ছিটকে পড়ত।

তুষারঝড়ে বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তাটা। সামনেই পুরু দেয়ালের মতো তুষারস্তূপের সাথে ধাক্কা লেগেছে স্লেজগাড়ির। ক্রান্তীয় অঞ্চলের বৃষ্টি যেমন হয়, তেমনিভাবেহঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে এলো সবকিছু আর বজ্রপাতের মতো গর্জে উঠল স্লেজগাড়ি।

ঝড়ে তানিয়ার কানে তালা লেগে গেছে। হঠাৎ করে তাদের দিকে একটা ঘোড়া ছুটে আসতে দেখল তানিয়া। ঘোড়ার স্লেজে কে বসা আছে দেখতে পায়নি সে, কারণ মুহূর্তেই কুকুরের পাল ভয় পেয়ে ঘেউঘেউ শুরু করল। স্লেজগাড়ি নিয়ে পাগলের মতো ছুটতে লাগল ওরা, তানিয়া ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল। কলিয়া বুঝে উঠতে পারেনি কেন তানিয়া চিৎকার করে উঠল, কিন্তু তানিয়া ঠিকই জানে কী হয়েছে, কুকুরগুলো আর তানিয়ার আদেশ মানছে না।

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তানিয়া তুষারস্তূপের মধ্যে কাইউরটা বল্লমের মতোগেঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু স্লেজগাড়ির ধাবমান গতিতে মটমট করে ভেঙে গেল কাইউর।

কলিয়ার দিকে তাকাতেই তানিয়ার মুখে ফুটে উঠল বিভীষিকার চিহ্ন।

'স্লেজ শক্ত করে ধরো,' তানিয়া চেঁচিয়ে উঠল।

টাইগারকে মাথার ওপরে তুলে ধরে বাইরে ছুড়ে দিলো তানিয়া। প্রথমে থমকে দাঁড়াল টাইগার, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল কী করতে হবে। তানিয়ার বাড়ির রাস্তার দিকে ছুটতে লাগল সে। কুকুরপালের সামনে এগিয়ে ছুটতে ছুটতে বুঝতে পারল তার দম ফুরিয়ে আসছে।

আর ঘোড়াটা তাদের ছাড়িয়ে ছুটে গেল অনেকদূর।

'আহা! আমারটাইগার!' তানিয়া ভাবল।

নরম নরম তাজা বরফে বারবার ডুবে যাচ্ছিল টাইগার। তাই বড়বড় লাফ দিয়ে ছুটতে লাগল। জিহ্বা বের করে দম নিচ্ছিল সে, আর নিজের ছোটছোট পা ও দুর্বল লম্বা ঘাড়ের জন্য হয়তো মনে মনে দায়ী করছিল নিজের ভাগ্যকে।

কিন্তু এই মেয়েটিকে সে বড্ড ভালোবাসে। যখন সে ছোট্ট কুকুরছানা ছিল, তখন ছোট্ট তানিয়ার সাথে খেলত। তার শৈশবের খেলার সাথি ছিল তানিয়া। কিন্তু জীবন বড় অন্যায় করেছে তার সাথে–সে বুড়ো হয়ে গেল একাই।

টাইগার বরফের স্তূপের মাঝে বসে পড়ল আর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

টাইগারের তীব্র গোঙানি ও ঘড়ঘড় আওয়াজে মুষড়ে পড়ল তানিয়া। টলতে টলতে স্লেজের হাতল ধরল সে। কুকুরপাল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, আর তা চাপা পড়ে গেল ঝড়ের গর্জনে।

চলমান স্লেজগাড়ি আচমকা থমকে যাওয়ায় বেসামাল হয়ে উলটে পড়ল। গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ল ওরা। তানিয়া স্লেজের রানার ধরে ঝুলে রইল। মুহূর্তের জন্য মনে হলো সে অন্ধ হয়ে গেছে। স্লেজের দড়িদড়া তুষারের ঢিবির সাথে আটকে গেল আর কুকুরেরা মুক্ত হয়ে ছুটে গেল তুষারঝড়ের মাঝে।

তারা কেউ নড়ল না। তানিয়া স্লেজের পাশে বসে রইল, কলিয়া উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, আর টাইগারের প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে ওদের পাশে। তার কাচের মতো চোখজোড়া চেয়ে আছে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আকাশের দিকে। সবকিছুই থমকে আছে, কেবল নদীর ওপর দিয়ে শিস কেটে চলেছে ঝোড়ো হাওয়া।

তানিয়াই প্রথম উঠে দাঁড়াল। সে উলটানো স্লেজগাড়ি ঠিক করল, এরপরে ঝুঁকে পড়ে কলিয়াকে উঠে দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগল।

এই দুর্ঘটনা তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়নি। পূর্বের মতোই তার প্রতিটি ভঙ্গিমা তড়িৎ ও নির্ভুল। সে তার মুখের ওপরে জমা তুষার ঝেড়ে ফেলল এমনভাবে যেন কিছুই হয়নি।

কিন্তু কলিয়া হাঁটু মুড়ে বসে রইল।

'আমরা হেরে গেছি, তানিয়া। কী করেছি আমি!' কলিয়া ভেঙে পড়েছে মর্মে মর্মে। তার চোখজোড়া ছলছল করছে আর চোখের পাপড়িতে অশ্রুজল জমে তুষার কণায় পরিণত হচ্ছে। তার শরীর কেঁপে উঠে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। তানিয়া তাকে ধরে ফেলল।

'কলিয়া! প্রিয় কলিয়া!' ধরা গলায় বলল তানিয়া। 'আমরা মারা যাব না। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। শুধু আমরা এক স্থানে বসে থাকতে পারি না, আমাদের চলতে হবে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, কলিয়া?'



সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কলিয়াকে জড়িয়ে ধরে ওকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করতে লাগল। তানিয়া দুই হাত দিয়ে ওকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে রাখল যেন মনে হয় ওরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে। তুষারঝড় ওদের ওপর দিয়ে বয়ে গেল, আর ওদের যেন কয়েক পর্দা বরফের চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। বজ্রনিনাদে যেন বধির হয়ে গেল ওরা।

তানিয়া পা দিয়ে টেনে আনল স্লেজগাড়িটাকে।

'না, না, তুমি আমাকে এভাবে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে পারো না। আমি বাচ্চা নই।'কলিয়া প্রায় কেঁদে উঠল।

সে তানিয়ার হাতের বাঁধন থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তানিয়া ওকে ঘাড়ে ধরে গাড়িতে উঠানোর চেষ্টা করতেই দুইজনের শীতল মুখ পরস্পরকে স্পর্শ করল। তানিয়া ফিসফিস করে একই শব্দ বারবার উচ্চারণ করার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রতিবারই তার আওয়াজ চাপা পড়ে যায় ঝোড়ো হাওয়ায়। কোনোরকমে সে বলতে পারল, ' আমরা পৌঁছাবই। আমরা পারব। অবশ্যই পারব।'সে বারবার বলতে লাগল। 'খুব বেশি দূরে নয়। তাড়াতাড়ি! আর দেরি করা যাবে না।'

কোনোমতে রাজি করানো গেল কলিয়াকে। স্লেজে চেপে বসল নিচু হয়ে। তানিয়া তার স্কার্ফ দিয়ে কলিয়ার মুখ থেকে বরফের আস্তরণমুছে দিলো। কলিয়ার হাত পরীক্ষা করে দেখতে লাগল সে–এখনো শুষ্ক আছে কলিয়ার হাত। কলিয়ার দস্তানা যাতে খুলে না যায়, তাই সাবধানতা বশত কলিয়ার দস্তানা থেকে সুতা বার করে কব্জি বরাবরদস্তানা বেঁধে দিলো।

এরপরে দড়ির একপ্রান্ত স্লেজের সাথে বেঁধে আরেকপ্রান্ত হাতে নিয়ে টানতে লাগল তানিয়া। ঢেউয়ের মতো পরতের পর পরত তুষার জমেছে। স্লেজ টানা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে এই ঢেউ খেলানো বরফের দিগন্তে।

ঢেউয়ের চূড়ায় উঠতে গলদঘর্ম হতে হয়, আবার ঢাল বেয়ে নামার সময় হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়। তুষারকণা ঘূর্ণিপাকে চোরকাঁটার মতো এঁটে যায় তানিয়ার পোশাকে। তার ওভারকোট ঢেকে যায় তুষারে, আর তাকে এখন চেনা বড় দায়।

মাঝেমধ্যে তানিয়া স্লেজ থামিয়ে কলিয়ার কাছে দেখে আসে সব ঠিকঠাক আছে কিনা।কলিয়াকে ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে তোলে আর জোর করে কয়েক কদম হাঁটায়। তানিয়ার দম নিতে কষ্ট হচ্ছে, ভিজে গেছে তার মুখ, আর বরফে ঢেকে গেছে তার পোশাক।

শহর কতদূরে তার কোনো ধারণা নেই। নদী আর আকাশকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। দুধ-সাদা কুয়াশায় ঢেকে গেছে সব।

পা টেনে টেনে চলল তানিয়া। কত বেলা এখন ভুলে গেছে সে। মাথা ঝুঁকে সাবধানে পা ফেলে চলছে। তপ্ত গরমের দিনের মতো তার পিঠ বেয়ে ঘাম ঝরে।

হঠাৎ করেই বন্দুকের গুলির শব্দে চমকে উঠল তারা। তার ফারের টুপি খুলে তানিয়া খেয়াল করে শুনল। এরপরে এক দৌড়ে এসে কলিয়াকে দাঁড় করালো।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করল তানিয়া, কিন্তু শুষ্ক বরফের টুকরোর খসখসানির মতো আওয়াজ বেরুল তার গলা দিয়ে।

'তুমি শুনতে পেলে, কলিয়া?' সে জিজ্ঞেস করল। 'দূর্গের বন্দুকের গুলির শব্দ। ওরা আমাদের নিশ্চয়ই খুঁজছে।'

কলিয়া নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল। তার সারা শরীর যেন অসাড় হয়ে উঠেছে।

তানিয়া স্লেজগাড়িটা ফেলে রেখে যাওয়ার চিন্তা করল। কলিয়াকে এক হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে অন্য হাত দিয়ে তার হাত ধরে ধীরে ধীরে স্লেজগাড়ি থেকে বের করার চেষ্টা করল তানিয়া।

তারা বাম দিকে ঘুরল। দ্বিতীয়বারের গুলির শব্দ কানে এলো তাদের। এবারের শব্দ আগেরবারের থেকেও জোরালো, আর তা নদীর ওপর থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো।

বাতাসের তোড় ঠেলে এগোতে লাগল তানিয়া। ঈশ্বর সহায় যে, সে শ্বাস নিতে পারছে। তার পায়ের সামর্থ্য আছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার। তার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে রাখতে শক্ত-সামর্থ্য হাতও আছে তার। কিন্তু একটা অজানা ভয় তাকে গ্রাস করল মুহূর্তেই। তার মনে হলো এই ঝোড়ো বাতাস আর তুষারের রাজ্যে সে একা, একেবারেই একা।

ইতোমধ্যেই সীমান্তরক্ষী বাহিনী ঝড়ের মধ্যে স্কি করে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। নির্ভয়ে তারা বড় একটা দড়ি দিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে আছে।

সেই একই ঘন কুয়াশা, সেই একই তুষারের ঢিবি, সেই একই তুষারের ঢেউ পেরিয়ে স্কি করছে তারা, তবে দম নেওয়ার জন্য দাঁড়াতে হচ্ছে না তাদের। যখনই ঝোড়ো হাওয়া করাল রূপ নেয়, তখনই ঝড়ের তোড় থেকে বাঁচার জন্য মাথা নিচু করেতারা।

ক্রমশই তারা এগিয়ে আসছে যেখানে তানিয়া দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের মাঝে মাত্র দুই কদম দূরত্বের আগ পর্যন্ত তারা কাউকে দেখতে পেল না। তানিয়া ভেবেছিল কলিয়াকে আগলে রেখে সে একাই তুষারঝড় পাড়ি দিচ্ছে। তার মুখে জমা স্বেদবিন্দু জমে তুষারকণায় পরিণত হচ্ছে, তার সমস্ত শক্তিই নিঃশেষ হয়ে গেছে, প্রতিটি ঝড়ের দমকে টলমল করে ওঠে তার শরীর। নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার লড়াই চালিয়ে গেল।

হঠাৎ কুয়াশার দেয়াল ভেদ করে একটা হাত তার সামনে এগিয়ে এলো। দড়ির মতো কিছু একটার সাথে তার কনুইতে ঘষা লেগেছে মনে হলো। সে মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরল দড়িটাকে। সে ভেবেছিল এটা হয়তো সেই তুষারে ঢেকে যাওয়া বজরা-নৌকার দড়িদড়া। সে দড়ি ধরে এগোতে এগোতে স্পর্শ করল তার বাবার গ্রেট কোট। তুষারে ঢেকে যাওয়া চোখের দৃষ্টিতে কিংবা অবশ হয়ে যাওয়া আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে বুঝতে পারল না তার বাবার উপস্থিতি, কিন্তু তার মন বলছিল এই দুর্ভেদ্য কুয়াশায়, এই আঁধারে, এই হিমশীতল মরুভূমিতে ওত পেতে থাকা মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্য তার বাবা আসবে।

'বাবা! বাবা!' শিশুর মতো কেঁদে উঠল তানিয়া।

'এই তো আমি, মা,' তার বাবা উত্তর দিলেন।

তানিয়ার যন্ত্রণাক্লিষ্ট চোখ বেয়েঅশ্রুজল ঝরে।

'ও বেঁচে আছে, বাবা।'সে কলিয়াকে তার বাবার কাছে ঠেলে দিলো।

ফুঁপিয়ে উঠল তানিয়া, কাঁদতে কাঁদতে তার বাবার পায়ের কাছে বসে পড়ল। তার বাবার হাঁটুর ওপরে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল। তার বাবা উবু হয়ে বসে টেনে তুললেন তানিয়াকে। গ্রেট কোট খুলে তার দুই সন্তানের ওপরেঢেকে দিলেন তিনি।

তার বাবার কী হয়েছে? তাকেও মনে হলো ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, তানিয়ার মতো অশ্রুসিক্ত চোখে বিপর্যস্ত লাগছে তাকে। এটা কি আসলেই অশ্রুজল না কি বরফ গলে গলে পড়ছে তার গাল বেয়ে?

'তোমাদের কথা ফিল্কাই বলেছে আমাকে,' তিনি বললেন।

'ফিল্কা... ফিল্কা...' তানিয়া পুনরাবৃত্তি করল।

তারা মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে ছিল, এর মধ্যেই তাদের ওপরে বরফের আস্তরণ জমতে শুরু করেছে। তানিয়ার বাবা দড়িতে টান দিতেই তার দুই পাশে আচমকা লাল ফৌজের সৈন্যরা তুষারঝড়ের মাঝে সাদা মেঘদলের মতো উদয় হলো। তারা একমুহূর্তের জন্যেও দড়ি ঢিলে করেনি।

সবার শেষে আগমন ঘটল ফ্রোলভের। তুষারঝড়ে তার আপাদমস্তক বরফে ঢেকে গেছে, এমনকি তার কাঁধে ঝোলানো বন্দুকটা পর্যন্ত।

'আমরা ওদেরকে খুঁজে পেয়েছি,' তার মুখে বিজয়ের হাসি। 'বলেছিলাম-না আমরা পারব। আমাদের পারতেই হতো।'

সৈন্যরা ভিড় করল কর্নেল ও তার দুই সন্তানের চারপাশে। তুষারঝড়ের মাঝেই তারা একসাথে ফিরতে শুরু করল।

শেষবারের মতো দূর্গ থেকে কামানের গোলাবর্ষণ হলো।

****

ষোলো

তুষারঝড়ের বিরুদ্ধেতানিয়ার বিজয়ের দিনটা পার হলো। এই জীবনযুদ্ধ সে সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছে।এই বিজয় তার কাছে দ্বিগুণ আনন্দের, কেননা এই দিনে তার বাবা সন্তানের জন্য হারানো ভালোবাসা ফিরে পেয়েছেন। তানিয়ার জন্য ভালোবাসা পূর্ণতা দিয়েছে তাকে, তার হৃদয়কে করেছে উষ্ণ।

আজ সকালে আবহাওয়া অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছে। ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

একটা স্থবিরতা এসে ভর করল নদী, পাহাড় আর তানিয়ার মনে। সিডার আর দেওদার গাছের ওপরে জমা বরফ ঝেড়ে ফেলেছে ঝোড়ো হাওয়া। আবারও সবুজ হয়ে উঠল বন। তানিয়া সবুজ বনের দিকে তাকালেই স্নিগ্ধতা অনুভব করে। আর ইচ্ছে করে না নতুন কিছু দেখার।

ঝড়ে কলিয়ার কান ও গাল তুষারপীড়িত হয়েছে। তাই বাইরে যাওয়ার অনুমতি মিলছে না তার। কিন্তু তানিয়া ও ফিল্কা তার সাথে রোজই দেখা করতে আসে। মাঝেমধ্যে ডিনারেও থেকে যায় তারা।

বাবার বাড়িতে ডিনার করা এখন আর অগ্নিপরীক্ষা মনে হয় না তানিয়ার কাছে। তার বাবা আজকাল খাবার জন্য জোরাজুরি করেন না। নাদিয়ার লোকদেখানো আদরও কমেছে।তানিয়ার কাছে খাবারও সুস্বাদু লাগছে।

সোফাতেতার বাবার বেল্ট আগের মতোই পড়ে থাকে, কিন্তু এখন আগের থেকে বেশ আলাদা লাগে। তানিয়া মাঝেমধ্যে তার কোমরে বেঁধে নেয় এটা।

তানিয়া এত সুখী এর আগে কখনো হয়নি।

কিন্তু ছুটি আর কতদিন থাকে! বেশ কিছুদিন ধরে তানিয়ার স্কুলে যেতে হচ্ছে।

স্কুলব্যাগ কাঁধে নিতে আর ভালো লাগে না তার, চটপট হাতে করেবই নিয়ে যায়। ক্লোকরুমে এসে বড় আয়নাটার সামনে টেবিলের ওপরে বই-খাতা ছুড়ে ফেলে। এরপরে সে কোট খুলে রাখে।

অন্যান্য দিনের মতো আজও তানিয়া ক্লোকরুমে এসে বই-খাতা টেবিলে ছুড়ে ফেলে কোটের একপাশের হাতা খোলার সময়ে সচরাচর যে কাজটা করে না, আজ তাই করল। আয়নাটার দিকে তাকাল সে, কেননা একদা এই আয়নাই তাকে বড় একটা শাস্তি দিয়েছিল। যদিও সে নিজের চেহারা দেখতে আয়নার দিকে তাকায়নি, আয়নায়দেখতে পাওয়া বাচ্চাদের ভিড়ের দিকে তাকাল তানিয়া।

বাচ্চাদের ভিড় অর্ধবৃত্তাকার হয়ে আছে তার পিছনে। ওরা কী যেন মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল। ভালো করে তাকালে দেখা গেল, দেয়ালে টানানো খবরের কাগজ পড়ছে ওরা।



ঝেনিয়া দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, ‘ওকে আমাদের দল থেকে বহিষ্কার করা উচিত।’

‘একদম ঠিক কথা! যা বলেছ!’ মোটা ছেলেটা ঝেনিয়ার কথা সমর্থন করে মাথা ঝাঁকায়। সে এই শহরে সেদিন এসেছিল, যেদিন কলিয়াও এসেছিল।

তানিয়া বুঝে উঠতে পারেনি কাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। সে ওদের কাছে এগিয়ে গেল না। কয়েক মিনিট পরে সে দেয়ালের গায়ে সাঁটানো খবরের কাগজের দিকে এক নজরে তাকাল।

‘কী হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

ওর কণ্ঠস্বর শুনে বাচ্চারা ওর দিকে ফিরে তাকাল, কিন্তু কোনো কথা না বলে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল ওরা।

ক্লাসে সবার প্রিয় ছিল তানিয়া, তাই স্বাভাবিকভাবেইঅবাক হলো সে।

‘কী হচ্ছে এসব?’ সে রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করল।

বাচ্চারা কোনো উত্তর দিলো না।

সে আবার খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর দেখতে লাগল। একটা জায়গায় এসে আটকে গেল তার চোখ।

‘স্কুল জীবন

দুই নম্বর স্কুলে একটাআপত্তিকর ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সংবাদদাতার রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা যায় যে, অত্র স্কুলের সপ্তম গ্রেডের ছাত্রী তানিয়া সাবানেয়েভা তার সহপাঠী কলিয়া সাবানেয়েভাকে নিয়ে সাম্প্রতিক তুষারঝড়ের সময়ে কুকুরে টানা স্লেজে চেপে ঘুরতে বের হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে কলিয়াকে তুষারপীড়িত হয়ে এই শীতকালীন অবকাশ বাড়িতে বিশ্রামে কাটাতে হয়। একই ক্লাসের আরেক ছাত্র ফিল্কা বেলোলায়ুভস্কি তুষারঝড়ের মধ্যে দূর্গে ছুটে গিয়েছিল কলিয়ার বাবাকে উক্ত ঘটনা জানিয়ে সতর্ক করতে। ফলে, তাকে হিম দংশেআক্রান্ত হতে হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাদের উদ্ধার করে।

এহেন শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা নিয়ে কী ভাবছে অত্র স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী এবং পাইওনিয়র প্রতিষ্ঠান?’

‘এর মানে কী?’ তানিয়া বারবার বলল।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তার পাশে একমাত্র ফিল্কাই দাঁড়িয়ে আছে।

সাথেসাথেই বুঝতে পারল কী হয়েছে। সে এটা বুঝতে পারল, ঝড় চারদিক থেকেই আক্রমণ করতে পারে, পারে নিজের চার দেয়ালের ঘরের মাঝ থেকেও পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে নিতে।

তার হাত ঝুলে পড়ল অসহায়ের মতো। কাঁধে রাখা কোট মাটিতে পড়ে গেল। সে এটা তুলল না পর্যন্ত।

‘এখানের একটা কথাও সত্যি নয়, ফিল্কা।’তানিয়া ফিসফিস করে বলল।

‘অবশ্যই সত্যি নয়,’ ফিল্কাও পালটা ফিসফিস করে বলল। তার ব্যান্ডেজ করা আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগল, ‘কোনো ব্যথা নেই। “ফ্রস্ট বাইট” যাকে বলে! কিন্তু আমার কথা শোনো।কথা শোনো, তানিয়া।’

ফিল্কা কথা বলতে বলতেই তানিয়ার মুখ অল্প একটু হা হয়ে গেল। তার নিশ্বাস নিতে এত কষ্ট হচ্ছে যে তুষারঝড়ের সময়ের কষ্টটা যেন মামুলি।

কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। কেবল এতটুকু কথা সে বলতে পারল, ‘কী হবে এখন আমার?’

দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে তানিয়া ক্লোকরুম ছেড়ে বের হয়ে গেল। বারান্দা ধরে বড়বড় পা ফেলে ছুটতে ছুটতে বাচ্চাদের ভিড়ের সামনে পড়তেই ওরা সভয়ে সরে গেল। বারান্দার কোণ ঘুরতেই এক বুড়ো মানুষ ওকে ইশারা করে ডাকলেন। যদিও বুড়ো মানুষটি এই স্কুলের অধ্যক্ষ, কিন্তু তানিয়া তাকে সম্ভাষণ না জানিয়েই গটগট করে হেঁটে চলে গেল। বুড়ো মানুষটি বেদনাহত হয়ে মাথা নাড়লেন, আর তার পাশে দাঁড়ানো ইতিহাসের শিক্ষক আরিস্তার্খ আরিস্তার্খোভিচ আরিস্তার্খভের দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ, এই মেয়েটাই,' আরিস্তার্খ আরিস্তার্খোভিচ বললেন। 'আর আমার বিন্দুমাত্র আফসোস হচ্ছে না যে, আমিই পত্রিকার সম্পাদকের কাছে এই অঘটন জানিয়েছিলাম।'

তানিয়া বারান্দা ধরে হেঁটে চলে। তার বুকের ধুকধুক আওয়াজে চাপা পড়ে গেল চারপাশের কোলাহল। কী করবে সে? তার সাথে কেনই-বা এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে।

'আমার বন্ধুরা সব কোথায়?' সে ভাবতে লাগল।

আসলে সবার কাছ থেকে সে পালিয়ে বেড়াতে চাচ্ছে। আগে এমনটা কখনো হয়নি।

****

সতেরো

ফিল্কা ভালো করেই জানে একমাত্র সে-ই তানিয়াকে সাহায্য করতে চায়, মন থেকে তার ভালো চায়। কিন্তু সে বুঝতে পারল, আজ তার কিংবা তার বন্ধুদের কারও আচরণই ঠিক ছিল না।

বারান্দায় তানিয়ার খোঁজে ছুটল সে। কিন্তু সে দেখল সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন আরিস্তার্খ আরিস্তার্খোভিচ আরিস্তার্খভ। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে বারবার মাথা নাড়ছিলেন তিনি। ফিল্কা তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে আসল পিছনে।

ক্লোকরুমে ফিরে গিয়ে শান্তি পেল না সে। বাচ্চারা এখনো দেয়ালে সাঁটানো খবরের কাগজের সামনে ভিড় করে আছে। তানিয়ার বাবার দেওয়া উপহার সেই কোট বইপত্রের সাথে মেঝেতে পড়ে আছে। সবাই পায়ে পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে ফারের কোটটা। পুঁতি বসানো ব্যাজারের পশমি কোট রেশমের মতো চিকচিক করছে। তবুও তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

ফিল্কা অভ্যাসবশত প্রায়ই চিন্তামগ্ন হয়, আজও তাই গভীর ভাবনায় পড়ে মনে মনে বলল, 'যদি লাল তারা শিরস্ত্রাণ পরা পুরোনো দিনের সৈনিক, কিংবা এ যুগের সৈনিক যুদ্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা না করে, তবে যুদ্ধে বিজয়ের প্রত্যাশা করা বাতুলতা। তেমনি তোমার বন্ধুরা কেবল তোমার উপস্থিতিতে তোমাকে মনে রাখে আর তুমি কাছে না থাকলে ভুলে যায়, তবে তুমি আর কখনো তাদের মনে জায়গা করে নিতে পারবে না। ভেবে দ্যাখো, একজন শিকারী জঙ্গলে ছুরি হারিয়ে বনপথে কারও সাথে দেখা হলে যদিতার কাছে হারানো ছুরির কথা জিজ্ঞেস করতে না পারেন,

তবে তিনি ঐ জঙ্গলে কখনো নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারবেন না।'ফিল্কা ভাবতে ভাবতে ধুলোয় ভরা মেঝেতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল।

ক্লোকরুমে বাচ্চারা এসে ভিড় করতে লাগল। ফিল্কার হাতের আঙুল মাড়িয়ে দিচ্ছিল তারা, তবুও সে কোনোরকমে তানিয়ার বইপত্র আর কোট কোনো একজনের বুটজুতোর তলা থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছিল। এই বুটজুতোজোড়া মোটা ছেলেটির যাকে তানিয়া সবসময় দুষ্ট ছেলে ভাবে। মোটা ছেলেটা কলিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমি হাজারবার বলব এটা। তোর তানিয়াকে আমাদের পাইওনিয়র দল থেকে বহিষ্কার করা উচিত।

কলিয়ার মুখ থেকে যেন রক্ত সরে গেল। এখনো সে তার ফারের টুপি খুলতে পারেনি। রাগে গোঁ গোঁ করতে লাগল। কোনোভাবেবলতে পারল, 'আর একটা বাজে কথা যদি ওকে নিয়ে বলিস ভোটকা, তুই কত বড় লম্বু আর কত মোটকু, তা কিন্তু আমি ভুলে যাব। কুত্তার বাচ্চারমতো ঘাড় ধরে বাইরে ছুড়ে ফেলে দেব।'

অট্টহাসি দিয়ে মোটা ছেলেটা বলল, 'আমায় ছুড়ে ফেলবি তুই? আমাকে পারলে নড়া এখান থেকে।'

মোটা ছেলেটা কলিয়ার হুমকি-ধামকি তেমন গা করল না। তবে ম্যালেরিয়া জ্বরের পরে দুর্বল শরীর নিয়ে কলিয়া বোধহয় তার হুমকি বাস্তবায়ন করতে পারবে না। বড়জোর হয়তো তার শত্রুর বুকে একটা চাটি মারতে পারবে।

মোটা ছেলেটা হাত মুঠো করে কলিয়াকে ঘুষি মারতে যাবে, এমন সময় ফিল্কা তার চিন্তাভাবনা দূরে সরিয়ে ক্ষিপ্রতায় হাত উঠিয়ে নিল মেঝে থেকে। এই তড়িৎ গতির জন্যগাছে চড়বার অভিজ্ঞতাকেধন্যবাদ দিতে হয়। সে দুম করে মোটা ছেলেটার ঠিক হাঁটুর পিছনে চাটি মারল। কাটা গাছের মতোমেঝেতে পড়ে গেল মোটা ছেলেটা।

ফিল্কা সাথে সাথে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল তানিয়ার কোট আর বইপত্র। ধুলো ঝেড়ে কোটটা টানিয়ে রাখল সে।

পরপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষে বাকি তিন নম্বর কাজ শেষ করার তর সইল না তার। মোটা ছেলেটাকে কাঁধ ধরে মেঝে থেকে তুলল সে। ব্যান্ডেজ করা তুষারপীড়িত আঙুল তুলে ওকে বলতে লাগল, 'তুই এই স্কুলে নতুন, আর এই শহরেও নতুন। একজন মানুষ হতে চেষ্টা কর। কসম, আমি তোকে মানুষ বানিয়ে ছাড়ব যদি এটা আমার শেষ কাজও হয়।'

হঠাৎ সে খেয়াল করল তাদের থেকে মাত্র দুই কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং আরিস্তার্খ আরিস্তার্খোভিচ আরিস্তার্খভ।

ইতিহাসের শিক্ষক হাত তুলে থামালেন ওদের। তার সাথে আছেন কস্তিয়া,পাইওনিয়র দলপতি এবং স্কুলের অধ্যক্ষ।

'এক্ষুনি তানিয়া সাবানেয়েভাকে খুঁজে আমার কাছে পাঠাও,' কড়া আদেশের সুরে বললেন আরিস্তার্খ আরিস্তার্খোভিচ।

মোটা ছেলেটা আর ফিল্কা পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে কলিয়ার দিকে তাকাল। এরপরে তারা তিনজনই চোখ নামিয়ে ফেলল। তাদের আর ঝগড়া বা মারামারি করার সাধ নেই।

'তানিয়া কোথায় গেছে জানি না। কোথাও দেখিনি,' তিনজনই বলে উঠল। 'তাহলে ওকে আপনার কাছে পাঠাব কী করে, আরিস্তার্খ আরিস্তার্খোভিচ?'

কাঁধে কাঁধ জড়িয়ে তারা তিনজনই বারান্দা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল, আর চুপিসারে গাইতে শুরু করল,

'ভয় পেয়ো না বন্ধু,

তুমি নও যে একা,

গ্রানাদা, গ্রানাদা, তুমি যে আমারই গ্রানাদা।'*

(টীকা : সোভিয়েত কবি মিখাইল সভেৎলোভ ১৯২৬ সালে রচনা করেন 'গ্রানাদা' কবিতাটি। সোভিয়েত জাতীয়তাবাদ ধারণাকে অতিক্রম করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদ ধারণাকে অনুপ্রাণিত করে এ কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি পরবর্তীতে গান হিসেবে জনপ্রিয় হয়। স্পেনে গৃহযুদ্ধ চলাকালে এ গানটিঅনুপ্রেরণা জোগায়।)

****

আঠারো

সারা সকাল তারা গানটি গেয়ে চলল, কিন্তু তানিয়া ক্লাসে এলো না। এমনকি স্কুল যখন শেষ, তখনো সে লাপাত্তা। গানটি তাদের ঠোঁটেই মিলিয়ে গেল একসময়। শেষ ক্লাসে তারা নীরবে উসখুস করছিল। তাদের কলম পড়ে রইল টেবিলে।

আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা বেশ চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে নীরবে বসেরইলেন। তার হাসিখুশি মুখটা আজ বড্ড দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এমনকি তার পোশাকে এঁটে থাকা ছোট্ট তারাটাও যেন ম্লান হয়ে গেছে।

'তানিয়া কোথায়?কোথায় গেল? স্কুল শেষ প্রায়। স্কুলে, বাড়িতে কোথাও নাই সে। আমরা কি তাকে খুঁজে বের করতে পারি না, সোনামণিরা?' তিনি অনুরোধের সুরে বললেন সবাইকে। 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে অনেকেই ওর ভালো বন্ধু ছিলে!'

ক্লাস শেষে জনশূন্য আর নিস্তব্ধ স্কুলবড় অদ্ভুত লাগে। কোলাহল যেমন করে আচমকা থেমে যায়, তেমন করে বনে থেমে যায় টাপুরটুপুর বৃষ্টি। বৃষ্টির ফোঁটায় দুরুদুরু কাঁপে পপলারের পাতা। স্কুলে নেমে আসে অখণ্ড নীরবতা, কেবল বারান্দার শেষপ্রান্তে একটি শিশুর হাসির শব্দ শোনা যায় যেন রিনিঝিনি বাজে কিংবা ক্লাস শেষে বাড়ি ফেরার তাড়নায় মেঝের ওপর কারও ধুপধাপ দৌড়ে যাওয়ার শব্দ।

কিন্তু আজ পায়ের আওয়াজ থামছে না। ছেলেমেয়েরা সিঁড়ি ভেঙে ওপর-নিচ করছে, ভিড় জমাচ্ছে বারান্দায়, আবার ছুটে যাচ্ছে স্কুলের প্রাঙ্গণে যেখানে তানিয়ার বরফ-পুতুল ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এখনো। তবে স্যাঁতসেতে বাতাসে কাঁধ গলে পড়েছে পুতুলের, ফৌজি টুপি থেকে বেরিয়েছে ছোট-বড় অনেকগুলো তুষার শলাকা। কিন্তু দৃষ্টি একইরকম আছে, যেন দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ঢেউ গুনছে।

'তানিয়া আবার নদীর কাছে গেল নাকি?' কলিয়া ফিল্কাকে জিজ্ঞেস করল।

ফিল্কা তাকাল তার দিকে।

'গতবারের মতো আবার ছোট্ট বনে কাঁদছে না তো?' ফিল্কা বলল মনে মনে।

তারা গেটের কাছে আলাদা হয়ে গেল।

কলিয়া স্কেটিং রিঙ্কের দিকে ছুটল। তুষারাচ্ছন্ন খাড়াই পথটা হোঁচট খেতে খেতে নেমে বজরা-নৌকার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নদী আর আলাদা করে চেনা যায় না। চারপাশে শ্বেতশুভ্র বরফ। পাহাড় ছেয়ে আছে সাদা সাদা বরফে। দেওদার মঞ্জরি আর দেখা যায় না। সব ঝরে পড়েছে আর তা চোরাবালির মতো ডুবে গেছে তুষারস্তূপে।

কলিয়া তানিয়ার নাম ধরে ডাকল একবার, দুইবার, বারবার। কিন্তু নীরব রইল নদী, কেবল তার সাদা আভায় ঝলসে দিলো কলিয়ার উন্মুখ দৃষ্টি।

শহরের অন্যপ্রান্তে ছোট্ট বনে দাঁড়িয়ে আছে ফিল্কা। এখানেই তানিয়ার দৃষ্টি এড়িয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল একবার, আজ তানিয়ার খোঁজে ডাকল তাকে। তখন বছরের পয়লা তুষারপাত শুরু হয়েছিল।ঝিরিঝিরিপড়ছিল তুষারের গুঁড়ো, মনে হচ্ছিল দুই হাতের তালুতে জমিয়ে রাখা যাবে সমস্ত বরফ। আজ ভারি তুষারপাত হচ্ছে। বরফেঢেকেআছে দেওদার গাছের বয়সি শাখা আর তুষারস্তূপে ডুবে গেছে নবীন বার্চ গাছগুলো। ফিল্কা ডেকে চলল তানিয়ার নাম ধরে। তার ডাকের উত্তর অন্তত যদি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসত, ঝোপের আড়ালে মুখ লুকিয়ে কেঁদে সান্ত্বনা খুঁজে পেত সে। কিন্তু নিরুত্তর রইল বন। অগত্যা ফিরে আসলো ফিল্কা।

কলিয়া আর ফিল্কার স্কুলের গেটে আবার দেখা হলো। অন্ধকার ক্লোকরুমে ঢুকে তারা দৃষ্টি বিনিময় করল। তাদের দৃষ্টিতে গভীর শঙ্কা।

'আমরা কী করব এখন?' ফিল্কা জিজ্ঞেস করল।

হঠাৎ তারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল যেখানে নৈশপ্রহরী শুকনো কাঠ রেখেছে স্টোভের তাকে।

'তানিয়া!' স্টোভের দিকে একসাথে ছুটল তারা।

কিন্তু সেখানে তানিয়া নয়, ঝেনিয়া দাঁড়িয়ে। দেয়াল ও স্টোভের মাঝের সংকীর্ণ জায়গায় জড়োসড়ো হয়ে কাঁদছিল আর মুখ আড়াল করে রেখেছিল ওদের কাছ থেকে। ফিল্কা তারকাঁধ ধরেসামনে মুখ ঘুরিয়ে আনল।

'তুই তো তানিয়াকে খুঁজতে যাসনি কোথাও?তাই না?' ফিল্কা জিজ্ঞেস করল।

'না আ আ আ...' ঝেনিয়া ফুঁপিয়ে উঠল।

'তাহলে কাঁদছিস কেন?'

'হয়তো...' ঝেনিয়া যেন বাতাস টেনে টেনে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। 'হয়তো... মারা গেছে কিনা!'

কলিয়া একটা কথাও না বলে ঘরের কোণে মেঝেতে বসে পড়ল। নীরবে দুই হাঁটুর মাঝে মুখ লুকিয়ে রাখল।

এই সময়ে সবার অলক্ষে তানিয়া উপরের তলায় পাইওনিয়রদের ভাঁড়ার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কারও ভাবনায় আসেনি যে তানিয়া এখানে থাকতে পারে।

পতাকা আর প্ল্যাকার্ড সমস্ত ঘরে ছিটিয়ে আছে। দেয়ালে টানানো প্রতিকৃতিতে যেন পাখির মতো ডানা গজিয়েছে, ঘর ছেড়ে উড়ে যাবে যেকোনো মুহূর্তে। জানালার গোবরাটে পড়ে আছে বিউগল আর ড্রাম।

ঘরের সমস্তকিছু যেন তানিয়ার সাথেকথা কইছে আর তার দিকে চেয়ে রইল নিষ্পলক।

ঘুমের মাঝেও এদের সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়াটা বেদনার!

কারণ তানিয়াকে ঘুমের মাঝেও বেদনাহত দেখাচ্ছে। আজ সারা সকাল তানিয়া এই ঘরটায় বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে ধুলোভরা মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমের মাঝেও সে স্বপ্নের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে পারছে না।

সে স্বপ্ন দেখছিল তাকে নিয়ে পাইওনিয়রদের সভা হচ্ছে, আর সেখানে তার বন্ধুরা সকলে উপস্থিত। কেউ ড্রামে বসেছে, কেউ টুলে বসেছে, আর কেউ-বা কাঠের ঘোড়ায়।সবার অঙ্গভঙ্গি আক্রমণাত্মক আর ভীষণ রাগী লাগছিল তাদের।

'ওর বিচার হবে, কোনো ক্ষমা নেই!' এক অচেনা লোক চেঁচিয়ে উঠল। লোকটার পোশাক-আশাক আর ভাবভঙ্গি কেমন অদ্ভুত অদ্ভুত ঠেকছিল। একটা ভারী আলখাল্লা গায়ে, তার ওপরে একটা আংরাখা পরে আছেন। গলায় পরেছেন নেউলের চামড়ার গলাবন্ধ। তার লম্বা কেশ দিয়ে অনেকটাই ঢেকে ফেলেছেন তার মুখাবয়ব।

'ওর বিচার করো,' আবারও চিৎকার করছিলেন তিনি। 'পাষণ্ড একটা মেয়ে।'

'হ্যাঁ, তানিয়া পাষণ্ড মেয়ে,' ঝেনিয়া ঘনঘন মাথা ঝাঁকায়। 'ও-ই আমারসুন্দর গোল্ডফিশটা ভেজে খেতে চেয়েছিল।'

'ওর বিচার করো। মেয়েটা ঈর্ষান্বিত। কুৎসিত হৃদয় ওর!'

'হ্যাঁ,হ্যাঁ, ঠিক তাই।'মোটা ছেলেটা সমর্থন করে বলল। 'সে কলিয়াকে ঈর্ষা করে। আমরা সবাই তা জানি। সে ইচ্ছে করে কলিয়াকে ঝড়ের মধ্যে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল যাতে কলিয়া মারা যায়।'

ঘুমের মধ্যেই তানিয়ার ঠোঁট পাঁশুটে হয়ে গেল।

কোটপরা ল্যাজঝোলা লোকটা তানিয়ার দিকে এগোতেই সভয়ে পিছিয়ে গেল তানিয়া। তানিয়ার অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ। সামনে যে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং গোগল। তার প্রতিকৃতিই দরজায় টানানো।

'আমি বড় দুঃখী গো!' তানিয়া তাকে ফিসফিস করে বলল। 'কেউ আমাকে সাহায্য করবে না? আমি কোনো খারাপ কাজ করিনি।'

তানিয়া জানালার দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে জানালার শার্সি গলে শ্বেতশুভ্র মেঘদল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ঘরে আর ভাসতে থাকে পুরো ঘরজুড়ে। দেখতে দেখতে মেঘদল রূপ নেয় অসংখ্য রুপালি নাইটে। তাদের ইস্পাতের বর্মে আলো দীপ্তি ছড়ায় আর সেই আলো মেঝেতে পড়ে লুটোপুটি খায়। আলো কলকল জলধারা হয়ে তানিয়ার পা ছুঁয়ে বয়ে যায়। পা উঁচু করতেই সে ভাসতে লাগল ওপরে, আরও ওপরে।কেউ তাকে ছুঁতে পারছে না। একসময় সে এই ভাঁড়ার ঘর পার হয়ে উঠোনে তার প্রিয় গাছটা ছাড়িয়ে উড়তে থাকে। তার গায়ে তবুও গাছের পাতার ছোঁয়া লাগে না। কী স্বাচ্ছন্দ্যে উড়ছে তানিয়া! স্কুলের উঠোন পেরিয়ে বহুদূরে সে নেমে এলো এক অচেনা রাস্তায়, এক নতুন পৃথিবী যেন তার সামনে পথ মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

এরপরে সে নিজেকে আবিষ্কার করল পাহাড় বেয়ে উঠতে। পায়ের নিচে খসখস করে ওঠে ব্লুবেরির ঝোপ। পাহাড়ি পথটা খাড়া হয়ে উঠেছে এখন, ছোটছোট শিলাপাথর গড়াতে শুরু করল তানিয়ার দিকে।

পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল সে। পাহাড়ের উতরাই বেয়ে নামতেই দেখা যায় গহন অরণ্য। এই অরণ্য বড় অদ্ভুত! গাছে গাছে সাদা ফুল ফুটে আছে। সূর্যের আলোয় গোলাপি ছোপ পড়ে এ ফুলের সাদা পাপড়িতে। আকাশে ভেসে বেড়ায় অসংখ্যপাপড়ি।

তানিয়া বিমোহিত হয়ে পড়ে।

'কী অপূর্ব বন!' তানিয়ার মুখে আনন্দ ধরে না।

'এটা বন নয়। ফলের বাগান, বোকা মেয়ে। ফলের মরশুম এখন।'শিলাপাথর গুড়গুড় শব্দে বলে উঠল।

'ফার গাছ কোথায়? কোথাও দেখছিনা যে!' তানিয়া জিজ্ঞেস করল।

হঠাৎ করেই যেন ফলের বাগান ভোজবাজির মতো উবে গেল।

তানিয়া হেঁটে চলেছে। এই পথে চড়াই-উতরাই নেই, নেই নুড়িপাথর। পথের শেষপ্রান্তে রাইয়ের খেত।শূন্যে পাক খেয়ে উড়ে বেড়ায় ঈগল পাখিরা। তাদের ছায়া নেচে নেচে উড়ে বেড়ায় পুরো খেত জুড়ে। হাওয়ায় দোল খায় পাকা রাইয়ের খেত যেমন করে নদীর ঢেউয়ে নৌকায় বসে দুলতে দুলতে আকাশ দেখা যায়। একে-অপরের গায়েঢলে পড়ে পাকা রাইয়ের শীষ যেন কান মলে দেয় পরস্পরের।

'কত্ত সুন্দর! এটা কী?' দুরুদুরু বুকে তানিয়া জিজ্ঞেস করল।

'এখন রাই পাকার সময়,' বিরক্ত মুখে উত্তর দিলো রাইয়ের খেত।

'অপূর্ব!' তানিয়া ফিসফিস করে বলল। 'নাকি এটা কোনো স্বপ্ন?হ্যাঁ, স্বপ্নই তো! আমি তো ঘুমিয়ে আছি। বাস্তবের জগৎকত দূরে!'

হঠাৎ করে সূর্য ঢেকে যায় আঁধারে। তানিয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল খণ্ড খণ্ড কালো মেঘের ভেলা আটকা পড়েছে জালের মতো মিহি কুয়াশায়।

সারা আকাশ ছেঁয়ে আছে কালো আঁধারে। চুলের মতো সরু বিজলি চমকায় দিগন্তে,আর আলো-আঁধারের ঝলক খেলে গেল রাইয়ের খেতের মাঝে। গা ছমছমে ভয় লাগে তানিয়ার। সে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। বজ্রনিনাদের পর্দা চড়তে লাগল আকাশপটে।

তার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল, তবুও তার ঘুম ভাঙে না।

ভাঁড়ার ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট মেয়ে বাজনডাণ্ডা হাতে ড্রাম বাজাচ্ছিল।

বাইরে সত্যি সত্যি বিজলি চমকাচ্ছিল আর তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বারান্দার দেয়ালে দেয়ালে।

বারান্দায় চলে এলো তানিয়ার সহপাঠীরা।কলিয়া ও ফিল্কা সবার আগে আগে, এরপরে ঝেনিয়া ও মোটা ছেলেটা। ওদের সাথে সাথে এলেন পাইওনিয়র দলপতি কস্তিয়া, আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা। তারা বেশ নিচু গলায় কথায় বলছিলেন। ড্রামের বাজনার মতো প্রতিধ্বনি তুলছে না তাদের কথা।

কলিয়া ভাঁড়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'এই ঘরটা ফাঁকাই থাকে। এখানে সভা করা যায়।'

সে দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। সে এখানে তানিয়ার খোঁজে আসেনি, আশাও করেনি এখানে খুঁজে পাবে। কিন্তু তানিয়ার কথাই ভেবে চলছিল সারাক্ষণ। ঘুমন্ত তানিয়াকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল সে।

কলিয়া তাকে ডাকার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু কোনো শব্দ বেরুল না তার গলা দিয়ে। সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, ইচ্ছে হচ্ছিল তানিয়ার কাঁধ স্পর্শ করে। হাত বাড়িয়ে দিলো তার দিকে, কিন্তু স্পর্শ করল না। তানিয়া এখনো গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তার চোখের পাপড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে আছে।

কলিয়া সবার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। হাত নেড়ে সতর্ক করল যাতে কেউ শব্দ না করে। সবার চোখ নিবদ্ধ তানিয়ার দিকে।



‘ওকে ঘুমাতে দাও। জাগিও না।’ফিসফিস করে বলল ঝেনিয়া। ‘আমরা কি তানিয়াকে ছাড়া সভা স্থগিত করতে পারি না? আমরা তো এখন জানি সত্যি কী ঘটেছিল। কলিয়া তো সব ঘটনা খুলে বলেছে।’

আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ভাবলেন। তিনি তার সব ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকালেন। ঝেনিয়া যেন কিছু লুকাচ্ছে, তার মুখে হাত রেখে হাসি আটকানোর চেষ্টা করছিল।

‘আমিও তাই ভাবছি,’ আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা বললেন। ‘আর আমি নিশ্চিত কস্তিয়াও দ্বিমত হবেন না।’

কস্তিয়া সবার দিকে তাকালেন। সকলের মনের ইচ্ছেও তানিয়াকে আর নতুন করে কোনো কষ্ট না দেওয়া।

‘শৃঙখলাই প্রথম,’ কস্তিয়া বলে চললেন। ‘কিন্তু এটা যেহেতু বিশেষ ঘটনা, আর সকলেরই তাই ইচ্ছা, সুতরাং আমরা এটা এটাকে ব্যতিক্রম হিসেবে নিতে পারি।’

কলিয়া ফিল্কাকে ইশারা করে চুপিচুপিবলল, ‘আমার জন্য একটা কাজ করে দে দোস্ত, ঐ পিচ্চি মেয়েটাকে ড্রাম বাজাতে নিষেধ কর, নইলে আমি ওকে খুন করব।’

ফিল্কা মাথা ঝাঁকিয়ে বারান্দায় গেল। সে মেয়েটার পিঠে আলতো করে চাপড় দিলো।

‘ভেতরে একজন ঘুমাচ্ছে, খুকি।’ফিল্কা বলতে লাগল। ‘আর তোমার বাজনায় তো পুরো দুনিয়া উঠে যাবে। আর ড্রাম বাজিও না।’

তারা সবাই যতদ্রুত সম্ভব ঘর ছেড়ে সারি ধরে সিঁড়ি ভেঙে নামছে আর তাদের পিছন পিছন ছোট্ট খুকি বাজনডাণ্ডা ওপরে তুলে ধরে ছোটছোট পায়ে নামছে, গলায় ঝুলছে বিশাল এক ড্রাম।

****

উনিশ

বন্ধুরা চলে যাওয়ার পরে তানিয়ার ঘুম ভাঙল। শেষ বিকেলের গোলাপি আভা লাগা আকাশ তাকে পথ দেখিয়ে বাড়ি নিয়ে চলল। তরতাজা বাতাসে তার মাথা হালকা লাগল, কিন্তু বুকে একটা অব্যক্ত বেদনার খচখচানিটা থামল না।

তার মাকে জানাতে হবে কী হয়েছে স্কুলে। কিন্তু এতে যদি তিনি কষ্ট পান, তাই এই ভাবনাটা বিদায় করল মাথা থেকে।

কিন্তু তার মা বাড়িতে ছিলেন না, আর এই প্রথমবারের মতো রাগ হলো তার।

সে তার নানিকে জলখাবারের জন্য কিচ্ছু বলেনি, জুতো আর পোশাক না ছেড়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। বাসায় মা থাকলে এমনটা কখনো করতে দিতেন না।

'আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আমি কোনো ভুল করিনি।'তানিয়া নিজেকে বলছিল। 'আমার কেন ভাই-বোন নেই, এতে তো আমার কোনোহাত নেই। আর আমি যা করিনি, তার জন্য আমি তো শাস্তি পেতে পারি না।নানু এত বুড়ো মানুষ, ঘরে আর কেউ নেই কথা বলার জন্য। কেন আমার একা থাকতে হবে? সব দোষ মায়ের। কেন বাবা তাকে ছেড়ে গেলেন? কোনো-না-কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে।'

তানিয়া আলো না জ্বেলে অন্ধকারে শুয়ে রইলদীর্ঘক্ষণ। একসময় তার দুই চোখের পাতা এক হয়ে ঘুম জুড়ে এলো। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে। অথচ সে চেয়েছিল মায়ের পায়ের আওয়াজ শুনেই তার কাছে ছুটে যাবে।

কেউ তানিয়ার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতেই তানিয়া ধড়মড় করে উঠে পড়ল। ঘরে আলো জ্বলছে। ঘুমভাঙা অর্ধনিমীলিত চোখে সে তার মায়ের মুখ দেখতে পেল। অনিশ্চিত আর উদ্বেগ-ভরা চাহনিতে তাকিয়ে আছেন তানিয়ার দিকে। তানিয়ার হঠাৎ মনে হলো তার মা তাকে চড় মারবে।

তানিয়া আচমকা কেঁদে উঠল।

তার মা ভ্রুকুঁচকালেন।

'এখনোস্কুলের পোশাক পরে শুয়ে আছ কেন?' কৈফিয়ত চাইলেন তিনি। 'তুমি ভালো করেই জানো, আমি এসব পছন্দ করি না। জলদি উঠে পড়ো।'

কিন্তু তার মা তানিয়ার এই ছোট্ট অনিয়মের দিকে আর ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তানিয়া সাথে সাথেই বুঝতে পারল কী হয়েছে।

'উঠে পড়ো,' তানিয়ার মা আবার বললেন। 'উঠে পড়ে চা খেয়ে নাও। এই কিছুক্ষণ আগে তোমার অধ্যক্ষের সাথে আমার কথা হয়েছে। তোমার সাথে কিছু কথা বলার আছে।'

তানিয়া বিছানা ছেড়ে উঠল না, বিছানার চাদরের এক কোনা খামচে ধরে বসে রইল।

তার মা তানিয়ার পাশে বসে পড়ে তানিয়ার হাত আলতো করে স্পর্শ করলেন। তানিয়া এ স্পর্শের মানে জানে। তিনি তার একাকী জীবনটা পার করছেন তো তার মেয়ের হাত ধরেই। এ স্পর্শ বলে দিচ্ছে তার মা কতটা মর্মাহত আর উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

'কী শুনলাম তোমার কথা। কী করে হলো?' তার মা জানতে চাইলেন।

'সত্যি নয় মা,' তানিয়া উত্তর দিলো। 'তারা যা বলেছে তুমি তা বিশ্বাস করো?'

তানিয়ার কণ্ঠ মনে হচ্ছিল জড়িয়ে যাচ্ছে। সারাদিন কথা না বলে আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার মুখ।

'আমি বিশ্বাস করিনি। কেউই আরিস্তার্খ আরিস্তার্খোভিচের কথা আমলে নেয়নি। তিনি তো তোমাকে স্কুল থেকে প্রায় বের করেই দিচ্ছিলেন।'

'কেন?' তানিয়া নিরুদ্বিগ্ন স্বরে বলল।

'তিনি বলেছেন তোমার মতো মানুষ স্কুলে খারাপ প্রভাব ফেলবে। কীসব অর্থহীন প্রলাপ বকেছেন!' তার মা মলিন মুখে হাসলেন।

কিন্তু তানিয়ার মুখে হাসি নেই।

'তোমার অনেক ভালো বন্ধু আছে। আমি খুশি হয়েছি।'তার মা বলে চললেন। 'আলেকসান্দ্রা ইভানোভনা তাদের মধ্যে একজন। অধ্যক্ষও ভালো মানুষ। অবশ্য উনি তোমার বাবার সাথে বেশ ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।'

'বাবাও সেখানে ছিলেন?' তানিয়া আমতা আমতা করল।

'হ্যাঁ।'

তার মা চোখ নামিয়ে ফেললেন। তার চোখেমুখে অস্বস্তির চিহ্ন।

'পত্রিকার খবরে মর্মাহত হইনি, কিন্তু তুমি আমাকে মর্মাহত করেছ। আমাকে কিছুই বলোনি। অন্যের কাছ থেকে শুনতে হয়েছে আমাকে। সম্পূর্ণ অচেনা মানুষেরা আমাকে তোমার ও কলিয়ার সম্পর্কের কথা বলেছে। তোমাকে তোমার বন্ধুরা 'ডিঙ্গো' নামে ডাকে। আমি তা-ও জানতাম না। মুখচোরা মেয়ে তুমি। তুমি কি আমাকে ভয় পাও? আমাকে ভালোবাসো না? উত্তর দাও।'

তানিয়া মাথা নাড়ে। কথা বলতে পারছে না সে।

'আমি সবসময়ই একা। সবসময় একাই থাকতে হয়।'অবশেষে কথা বলতে পারল সে। প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল, 'বাবা কেন আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন?আমাকে বলো। আমি শুনতে চাই। কার দোষ ছিল?'

তার মা সাথে সাথেই উত্তর দিলেন না। তানিয়াও তার মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না।

এক কি দুই মিনিট পার হয়েছে, কিংবা তার বেশি, এরপরে তার মা বলতে লাগলেন নিরুত্তাপ স্বরে, 'তানিয়া, মানুষ পরস্পরকে ভালোবাসে বলেই তারা একসাথে থাকে। যখন ভালোবাসা হারিয়ে যায়, তারাও আলাদা হয়ে যায়। এরকমই হয়ে এসেছে এতদিন, আর সামনে এভাবেই চলবে। এটাই দুনিয়ার নিয়ম।'তিনি থামলেন।

তানিয়া সাহস করে তার মায়ের মুখের দিকে তাকাল। উড়বার সময়ে পাখিরা যেমন সতর্ক চোখে ওপরে তাকায়, তেমন করেই তানিয়া তাকাল তার মায়ের দিকে।

তিনি মাথা সোজা রেখে বসে রইলেন, কিন্তু তার মুখ বড্ড যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেখাচ্ছে।

'কী তাকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে?' তানিয়া ভাবল। যখন সে তার মায়ের মুখের দিকে তাকায়, বেদনায় ভরে যায় তার মন।

পৃথিবীর সবচেয়ে মায়াবী দুটি চোখ চেয়ে আছে তানিয়ার দিকে, কিন্তু সে চোখজোড়া অশ্রুসজল।

'তোমার কি মনে হয় না এই শহর ছেড়ে আমাদের চলে যাওয়া উচিত, তানিয়া?'

তানিয়া আচমকা হাত দিয়ে বুক চেপে ধরল। ধরা গলায় বলতে লাগল, 'মা! এখনো তুমি তাকে ভালোবাসো!'

বলতে বলতেই মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল তানিয়া। উষ্ণনিশ্বাস নিচ্ছিলেন তার মা। তার মায়ের আরক্ত গাল ছুঁয়ে রইল তানিয়ার কেশ।

'মা আমার! প্রিয় মা! শুনবে না আমার কথা। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার চারপাশে সবকিছু শুধু ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে...'

তানিয়ার মনে হচ্ছিল তার সমস্ত জগৎ ঘুরছে, উলটে গেছে চারপাশ।

এই অনুভূতি বড়ই রহস্যময় এবং অদ্ভুত লাগল। তার প্রিয় সিনেমায় ম্যাক্সিমের গানে শুনেছিল–

'আকাশে উড়ছে আমার নির্ভীক বেলুন

চক্কর খায়, গোত্তা খায়,

নাচে ধেই ধেই

ঐ দূর আকাশের কোণে।'

বেলুনকে একমুহূর্তে লাগছে সন্ধ্যার ছায়া, আবার কখনো ঝলসে ওঠাসূর্যরশ্মি।

'চক্কর খায়, গোত্তা খায়,

এই পড়ল বুঝি!

আমার নির্ভীক বেলুন!'

'যেয়ো না মা আমার! যেয়ো না, পায়ে পড়ি তোমার,' তানিয়া তার মায়ের কানে ফিসফিস করে বলল। পরস্পরের গাল ছুঁয়ে দুইজনের অশ্রুজল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

****

বিশ

'ভালোবাসা যে কতরকমের হয় রে, দোস্ত।'ঝেনিয়া বলল।সে তানিয়ার সাথে তার বাড়িতে জলের চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়েকথা বলছিল।

তারা এখন খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেছে। কাচের দেয়ালের মাঝ দিয়ে বাইরে তাকাল তারা। রাস্তার দুধারে বরফগলা জল জমে আছে। বসন্তের এমন আরও কিছু চমক দেওয়া ছবি চোখ জুড়ায় তাদের।

আকাশের কোলে আলসেমিতে গড়ায় ঢাউস সূর্য। জানালা গলে আসা হলুদ আলোর রেখা ছুঁয়ে শুরু হয় ধুলোকণার নাচন যেন সার্কাসের আশ্চর্য দড়া-বাজিকর। জলের চৌবাচ্চায় যখন ধুলো থিতিয়ে পড়ে, তখন মাছের লেজের ঝাপটায় তা যেন শত শত হীরের গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সেই বুড়ো টিনমিস্ত্রী আবার হাঁক ছেড়ে ডাকছে শহরের মোড়ে মোড়ে। তানিয়ার কাছে মনে হয় এই বুড়োই কাঁধে করে ধাতব পাতের সাথে বসন্তও বয়ে নিয়ে আসেন।

'তুই কি কখনো প্রেমে পড়েছিস?' ঝেনিয়াকে জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'হ্যাঁ রে, দোস্ত।তৃতীয় গ্রেডে পড়তাম তখন।'

‘কী করে বুঝলি তখন এটাই প্রেম?’

‘প্রথম প্রথম তো বুঝিনি। সে বলত, ‘ঝেনিয়া, পাটিগণিতটা একটু দেখা না?’ আমি মনে মনে বলতাম, ‘না, আমি পারব না।’ আমি জানতাম এটা অন্যায়। তবুও সে বলত, ‘প্লিজ ঝেনিয়া, দেখা না। আর জ্বালাব না তোকে।’ আমিও তাকে দেখতে দিতাম। আমি তখন আর না করতে পারতাম না। নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করতেও পারতাম না। এরকমভাবেচলতে লাগল। আমি একসময় খেয়াল করলাম স্কুলে আমি কম নম্বর পাচ্ছি। এরপরে সিদ্ধান্ত নিলাম, আর নয়! যথেষ্ট হয়েছে!’

‘কীভাবে শেষ করলি সব?’ তানিয়া আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল।

‘এটা তো খুব সহজ কাজ। ওর সাথে চোখাচোখি বন্ধ করে দিলাম। একদিন, দুইদিন, এভাবে চলতে লাগল যতদিন-না ওকে পুরোপুরি ভুলে গেলাম।’

তানিয়া উঠে বসে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল জলের চৌবাচ্চার দিকে। এরপরে বন্ধুর দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল। তার মুখে কোনো হাসি ছিল না। গোলগাল মুখের ঠান্ডা মাথার মেয়েটির যা ছিল তা হলো চমকে দেওয়ার মতো বুদ্ধি।তানিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিন্তু বাতাসে শিস কেটে বাজল তখন।

‘বাড়িতে শিস বাজাস না। এতে গৃহের অকল্যাণ হয়।’ঝেনিয়া বিজ্ঞের মতো বলল।

তানিয়া দম বন্ধ করল। এই বাড়িতে শীতকালে ফোটে তুর্কি ক্যাপ ফুল আর জলের চৌবাচ্চায় সাঁতরে বেড়ায় গোল্ডফিশ।

হঠাৎ করেই নীরব হয়ে যায় তারা। নীরবতা ভেঙে তানিয়া বলে উঠল, ‘তুই ঠিকই বলেছিস। ভালোবাসা অনেক রকমের হয়।’

আর কোনো কথা না বলে উঠে পড়ল সে।

বাইরে সেই বুড়ো টিনমিস্ত্রী এখনো ডেকে চলেছে।

বসন্ত এসেছে।

তানিয়াদের বাড়ির পিছনে ছোট্ট বনে শ্বেতপাথরের মতো বার্চ গাছের গোড়ায় জন্মেছে সবুজ সবুজ ঘাস আর নীলচে ফার গাছের শিকড়ে যেনমসজাতীয় শ্যাওলার চাদর বিছানো।

তানিয়া ফিল্কাকে ডাকতেই চোখ তুলে তাকাল ফিল্কা।

ফিল্কা গাছের ডালে বসেছুরি দিয়ে পেন্সিলের ডগা তীক্ষ্ণ করে নিচ্ছিল। তার কোলে বইপত্র স্তূপ করে রাখা আর ভীষণ ভারে গাছের ডাল এত দুলছিল যেন মনে হচ্ছিল দোলনায় চড়েছে পুরো বন।

ফিল্কা আজকাল বেশ পড়াশোনা করছে। নদীতীরে নাটক মঞ্চায়িত হওয়ার পর থেকেই তারা দুইজনে একসাথে সারাদিন কাটায়। স্কুলের পড়া তারা একসাথে পড়ে, আর তানিয়ার চটপটে স্মৃতিশক্তির জন্য দুইজনেই উপকৃত হয়।

তানিয়া একটা মোটা ডাল জড়িয়ে ধরে উঠে পড়ল গাছে।

এটা ডাউরিয়ান জাতের বার্চ গাছ, পাতাহীন গাছটায় অসংখ্য ডাল বাঁকা হয়ে নুয়ে পড়েছে মাটির কাছে। গাছের ডালে ফিল্কার পাশেবসে পড়ল তানিয়া।

‘আগামীকাল পরীক্ষা,আর তুমি চলে গেছ। পুরো এক ঘণ্টা ধরে তোমার দেখা নেই।’ফিল্কার গলায় চাপা অসন্তোষের সুর। ‘তুমি তো সব জানো। তাই অন্য কেউ পরীক্ষায় খারাপ করে কিনা এ নিয়ে তোমার মাথাব্যথা নেই। সে

পরীক্ষায় খারাপ করবেই। আমি জানি। এরকমটা হতো না যদি,' তিক্ততায় ভরে উঠেছে ফিল্কার গলার স্বর। 'সে পড়াশোনায় সময় দিত। যখন খুব বেশি দরকার ছিল, তখন তুমি তার পাশে ছিলে না।'

'কিন্তু ফিল্কা, তুমি তো উপপাদ্যটা পড়ে ফেলতে পারতে ততক্ষণে, আমি যখন ঝেনিয়াদের বাড়িতে গেলাম।'

'চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমায় দিয়ে কিচ্ছু হবে না।'ফিল্কা হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে বলতে লাগল। 'পড়াশোনা আমার কাছে আসলে পাখা গজায়, তাই মনে হয় উড়ে চলে যায়।'

'আবার শুরু করা যাক,' তানিয়া নোটখাতা বের করতে করতে বলল। 'যদি দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহলে স্পর্শবিন্দু...'পড়তে শুরু করল তানিয়া। চোখ তার বার্চের পাতায় পাতায়, শনশন করে ওঠে গা জুড়ানো বাতাসে।

কিন্তু ফিল্কা পেন্সিলের মাথা সূঁচালো করতেই ব্যস্ত, তার হাতে ধরা ছুরি সূর্যের খরতাপে ঘুঘুর ডানার মতো জ্বলজ্বল করে।

'দাঁড়াও, আমাকে বলো তো, তুমি কি সত্যি সত্যি কলিয়ার সাথে শিকারে যাচ্ছ?'ফিল্কা বলে উঠল।

'হু, তোমাকে তো আগেই বলেছি,' তানিয়া জবাব দিলো।

'তাহলে এই ব্যাপার! তাই তুমি সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরে এসেছ আর গাছে উঠবার অভ্যেস করছ?'

'হয়তো!'

'আর কলিয়া যদি না আসে!'

'সে আসবে,' তানিয়ার চোখ এখনো বার্চের পাতায় পাতায়।

'তোমার বাবা যদি জানতে পারেন?'

'জানবেন না।'

'তোমার ভয় করছে না, কেউ যদি তাকে জানিয়ে দেয়?'

তানিয়া কাঁধ ঝাঁকাল।

'তুমি ছাড়া তো আর কেউ জানে না। আর তুমি তাকে অবশ্যই বলবে না।'

তানিয়া সন্দেহের চোখে ফিল্কার দিকে তাকাল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তাকে যদি তার কথায় কোনো উপহাসের সুর আছে কিনা।

কিন্তু ফিল্কা সারাজীবনে কখনো রাশভারী ছিল না। জীবন নিয়ে কৌতুক করতে ভালোবাসে।

'আমি জায়গাটা চিনি।'ফিল্কা ভাবুক সুরে বলল। 'সক্কাল সক্কাল তিতিরপাখি খাবারের খোঁজে আসে।শিকার করার তখনই সেরা সময়। কিন্তু তোমার সেখানে যাওয়া উচিত হবে না। তুমি নেহাৎ একটা মেয়ে!'

'বেশ! আমি তাহলে যাচ্ছি,' তানিয়ার একগুঁয়ে সুরে বুঝতে পারল ফিল্কা যে, তানিয়া যাবেই। সে সিদ্ধান্ত বদলাবে না।

তানিয়াকে থামানোর জন্য ফিল্কাযা ভেবেছে, তার সবই বলল, কিন্তু তার আর করার কিছুই রইল না। সে তানিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। তানিয়ার মুখে আর পোশাকে পড়ে সূর্যাস্তের আভা।

'তার সাথে শুধু শুধুইকথা খরচ করেছি,' ফিল্কা ভাবল। 'কোনো ভয় নেই ওর।'

কিন্তু ফিল্কা তানিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল তানিয়ার চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। সতর্ক হয়ে ফিল্কা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'শুঁয়োপোকা একটা!' তানিয়া আর্তনাদ করে উঠল।

সে পোশাক গুটিয়ে এনে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। তার পোশাকে শুঁয়োপোকা লেগে আছে। সে আবারও চেঁচিয়ে উঠল, 'শুঁয়োপোকা!শুঁয়োপোকা! ঐ যে নড়ছে! বমি আসছে আমার! কেটে ফ্যালো এক্ষুনি।'

ফিল্কা দ্বিধাগ্রস্ত চোখে তার ছুরির দিকে তাকিয়ে রইল। তার ছুরি তুরপুনের মতো তীক্ষ্ণ।সে এটা দিয়ে তানিয়ার জন্য পিঁপড়ের শরবত আর রজন সংগ্রহ করত। ছুরি ওপরে তুলে ধরতেই এটা সূর্যের আলোয় ঝলসে উঠল আর নিচে নেমে এলো মুহূর্তেই। ঘ্যাচ করে কেটে গেল তানিয়ার পোশাকের একপ্রান্ত।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তানিয়া কিছু বুঝতে পারেনি। পরমুহূর্তেই পুরোনো ভয়টাই জেঁকে বসেছে তার মনে। তানিয়া হাতের মুঠোয়কিছু একটা শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে। ধীরে ধীরে হাতের মুঠো খুলে শুঁয়োপোকার বদলে ছোট্ট একটা ভাঙা ডাল দেখতে পেল।

তানিয়া তার পোশাকের দিকে তাকাতেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। তার পোশাকে বড়সড়ো একটা জায়গা কেটে গেছে।

'আমি কী পরব এখন? এটা কেন করলে ফিল্কা?'

'তুমিই তো আমায় বললে"কেটে ফ্যালো এক্ষুনি"। অবশ্য এটা আমি ইচ্ছে করেই করেছি। তুমি তো এখন কলিয়ার সাথে ঘুরতে যেতে পারবে না। নাকি যাবে?'

'হ্যাঁ। আমি যাব। আগেও যেমন বলেছি, এখনো তাই বলছি।'তানিয়া চিৎকার করে বলল। তানিয়া ডালের ওপর থেকে লাফিয়ে নিচে নামল। এরপরে সে ঘন ঝোপ আরসাদা-কালো বার্চের মাঝ দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

ফিল্কা একা বসে রইল। তার কোল থেকে ধপাস করে জ্যামিতি বইটা মাটিতে পড়ে গেল।হঠাৎ জঙ্গলের সবচেয়ে কৌতূহলী বাসিন্দা কাঠবিড়ালি হাজির হলো ছোটছোট পায়ে দৌড়ে এসে।ফিল্কার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল কাঠবিড়ালিটা। ফিল্কা তার হাতে ধরা ছুরিটা কাঠবিড়ালির সামনে ছুড়তেই কাঠবিড়ালি তার হাতের থাবা দিয়ে ধরে রাখা কাঠবাদাম মাটিতে ফেলে রেখে তানিয়ার মতো ছুটে হাওয়া হয়ে গেল মুহূর্তেই।

ফিল্কা ডাল বেয়ে ধীরে ধীরে নামল। সে কাঠবাদাম মাটি থেকে তুলে ধরে হাতে নিয়ে ওজন করছিল। বাইরের শক্ত খোলসের মধ্যেনরম শাঁস আছে এটায়। কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে গেল আর ভাবতে লাগল তানিয়ার কথা। পরমুহূর্তেই সে মনে মনে বলল কাঠবাদাম ভেঙেই খেতে হয়। সশব্দে তার দুই পাটি দাঁতের মধ্যে কাঠবাদামটিচাপ দিলো।

****

একুশ

শেষ রাত এখন।

ঘুমিয়ে পড়েছে পুরো শহর। চারপাশের অখণ্ড নীরবতার মাঝেও প্রতিটি শব্দকে আলাদা করে টের পাওয়া যায়।

তানিয়া একাই বেরুল সাহস করে।

এর আগেও তানিয়া বহুবার এই সময়ে বেরিয়েছে, একই পথে হেঁটেছে।কিন্তু পাশে তখন ফিল্কা ছিল, তার কাঁধে ছিল মাছ ধরার ছিপ-বড়শি। শরতের রাতে মৃদুমন্দ বাতাসে তারা হিহি করে কেঁপেছে। এই সময়ে পাতা ঝরে পড়ে আর হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় ঝরা পাতার দল। দিগন্তের কাছে নিভু নিভু জ্বলে রাতের তারা। আর এই শেষ রাতের দিকে আকাশপট জুড়ে জ্বলে অগুনতি তারা। ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত এভাবেই আলো ছড়ায় তারারা। তারাজ্বলা আকাশের নিচে শেষ রাতের আবছা আলোয় তানিয়া একাকী পথ চলল।

গন্তব্য সবুজ শৈলান্তরীপের দিকে।

বন চিরে চলে গেছে একটা প্রশস্ত পায়ে-হাঁটা পথ। বনতলের চেয়ে কম অন্ধকার আর পুরো পথ গাছের শিকড়ে শিকড়ে সাপের মতো আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। তানিয়া হেঁটে চলল নির্ভয়ে। মাঝেমধ্যে কেবল চমকে উঠছে শিশিরভেজা বার্চের পাতার আলতো স্পর্শে। আনমনে গাছের পাতা সরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর ভাবছে এই অভিসারের রোমাঞ্চকর অনুভবের কথা,শিহরণ ছুঁয়ে যায় তার মনের গহনে গোপনে।

কী হবে তখন যদি কলিয়া বলে ফেলে সে ভালোবাসে তাকে? কী করবে তখন? গতকাল কলিয়া তাকে অনুরোধ করেছিল দেখা করার জন্য,বলেছিল তাকে, 'প্লিজ এসো একবার, প্লিজ।'আরও বলেছিল, 'তুমি আসবে। অন্তত আমার জন্য। আমি কখনো বনে সূর্যোদয় দেখিনি। প্লিজ এসো, প্লিজ।'

কলিয়ার মনের ইচ্ছে পূরণ করেছে সে। কিন্তু এরপরে? কেউযখন ভালোবাসার কথা বলে, মেয়েরা কী করে তখন? বিশেষ করে মেয়েটার জীবন যদি মায়ের জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকে?

তানিয়া কেঁপে ওঠে।মাকে না জানিয়ে আজ তার সাদা অ্যাপ্রোন পরেছিল, আর এখন মায়ের কথা ভেবে নিজেকে নিজেই জড়িয়ে ধরলসে।

বন তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার প্রেমিকের কাছে।

কলিয়া তার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। চারপাশে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে বড়বড় পাথরের চাই আর তারই একটার ওপরে বসে ছিল কলিয়া। ম্লান হয়ে আসা নক্ষত্রের আলোয় চিকচিক করছে সাদা বালুরাশি। পাথরের চাঁই চকমক করছে যেন সদ্য বৃষ্টির জল ধুয়ে ফেলেছে সব।

তানিয়া এসেছে টের পায়নি কলিয়া। সে বুঝতে পারেনি তানিয়া সাদা অ্যাপ্রোন পরে চলে আসবে আর তার দিকে তাকিয়ে কলিয়া আলো-আঁধারিতে চিনতে না পেরে ছুট দেয়।তানিয়া তাকে ডাক দিলে সে ভয়ে ভয়ে ফিরে এলো।

সময় বয়ে যায় ধীরে ধীরে। এইপূর্ণ নীরবতায় তারা হেঁটে চলে বনের প্রান্তসীমার দিকে যেখানে দেওদার গাছের গায়ে ক্রমাগত কুয়াশা জড়িয়ে যায় যেন চরকায় কাটে সুতা।

তারা একসময় থামল পল্লবিত লার্চ গাছের নিচে।

'আজ তুমি এটা পরলে কেন?' কলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'তুমি যে পোশাকটা পছন্দ করেছিলে,ঐটা নষ্ট হয়েছে। তাই ওটা পরতে পারিনি।'

‘তাতে কী আসে যায়! তোমার পোশাক নিয়ে কিছু আসে যায় না আমার। শুধু তোমাকে নিয়ে ভাবি আমি।’

‘সারাক্ষণ?’

‘আজ্ঞে! সারাক্ষণ। তুমি কাছে না থাকলেও ভাবি। কী অদ্ভুত!তাই না?

‘হ্যাঁ, সত্যিই অদ্ভুত!’ তানিয়া মাথা ঝাঁকায়।

তারা লার্চ গাছের শিকড়ে বসল। ডালে ডালে বাজে পাতার মর্মর। চুপ করে তারা শুনে যায়। পাখিরা জেগে উঠেছে। পাখসাট বাজে চারপাশে। একটা নাট ক্রাকার পাখি দেওদার গাছের চূড়া থেকে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল।

‘পাখিটা সারারাত এই গাছেই ছিল, আর সকাল হতে না হতেই উড়ে চলে গেল,’ তানিয়া বলল।কিছুক্ষণের জন্য থামল সে। আবার ধীরে ধীরে সে বলতে লাগল, ‘আমি শুনে খুশি হয়েছি যে তুমি আমাকে নিয়ে ভাবো। তার মানে আমি যখন এখানে থাকব না, তখনো আমাকে নিয়ে তুমি ভাববে। আমি শিগগিরই চলে যাচ্ছি।’

কলিয়াকে দেখে মনে হলো যেন কেঁদে ফেলবে এক্ষুনি। এমন কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। তানিয়ার কথা সোজা কলিয়ার হৃদয়কে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলো।

‘তুমি চলে যাচ্ছ?’ কলিয়া জিজ্ঞেস করল।

তানিয়া চেষ্টা করে যাচ্ছিল যাতে তার গলা না কাঁপে।

‘হ্যাঁ, আমাদের সকলের জন্যই মঙ্গল হবে এটা। বাবা তোমাকে আর নাদিয়াকে নিয়ে থাকবেন। নাদিয়া চমৎকার মানুষ! বাবা তাকে ভালোবাসেন। কিন্তু মা যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাব। আমি তাকে কখনো ছেড়ে যাব না।’

‘কিন্তু কেন? কেন যাবে? তুমি কি আমাকে এখনো ঘৃণা করো?’

‘উঁহু, তুমি এ নিয়ে আর একটা কথাও বলবে না,’ তানিয়া নিরাসক্তভাবে বলল। ‘তুমি যখন প্রথম এই শহরে এলে, তখন কেন আমি এ ধরনের আচরণ করলাম, আমি জানি না। আমি ভয় পেতাম। আমার বাবা শুধুই আমার। তোমার নয়। অন্য কারও নয়। এই ভাবনার জন্য হয়তো তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি। আমি তোমাকে ঘৃণা করেছিলাম, তোমাকে ভয় পেতাম। কিন্তু কলিয়া,এখন আমি চাই তুমি সুখীহও।’

‘আমি জানি! আমি জানি!’ তার কণ্ঠে যেন আবেগের বাঁধ ভেঙে গেল। ‘আমিও চাই তুমিও সুখী হও। তোমার মা, বাবা, নাদিয়া আন্টি, সবাই। সবাই সুখীহোক। কেন সবাই হয় না?’

‘হয়তো সুখী হয়, হয়তো-বা না। আমি জানি না।’তানিয়া উত্তর দিলো।

তানিয়া চুপ করে রইল। তার সন্তুষ্টি, তার মায়ের সন্তুষ্টি, তার বাবার সন্তুষ্টি,সবকিছু যেন পূর্ণ করে রেখেছে তানিয়ার ভাবনা।

তানিয়া লার্চ গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে যেসব ভাবনা, সেসব তাকে শান্তি দিচ্ছে না। গাছের নিচে জমাটবাঁধা প্রশান্তির মাঝে নিজের নিরাময় খুঁজল সে।

কিন্তু লার্চ গাছও যেন কেঁপে ওঠে বাতাসে। নদীর পাড় হতে দমকা বাতাস এসে বন ছুঁয়ে যায়।

রাত গড়িয়ে ভোর আসে। মুছে গেছে আকাশের সব তারা।

‘আমি চাই প্রত্যেকেই সুখী হোক,’ তানিয়া পূর্বদিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। কুয়াশার অবগুণ্ঠন সরিয়ে নদীর জল ছুঁয়ে ধীরে ধীরে সূর্য তার অস্তিত্ব প্রকাশ করল।

‘আমাকে এখন যেতে হবে।সূর্য উঠেছে। বিদায়,কলিয়া!’

তানিয়া উঠে পড়ে বনপথে হাঁটতে শুরু করল সে। দেওদার আর সিডার গাছের সারির মাঝ দিয়ে তানিয়ার যাওয়ার পথ রোধ করে দাঁড়াল কলিয়া।

‘চলে যেয়ো না, তানিয়া!’ কেঁদে উঠল কলিয়া। ‘যেয়ো না, প্লিজ। তুমি যা বলতে চেয়েছ, তা বলোনি। আমি বুঝতে পারি।’

‘ওহ, হ্যাঁ,’ অবাক হওয়ার ভান করল তানিয়া। ‘আর কী জানতে চাও, শুনি?’

লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়ার ভয়ে তানিয়ার কাছ থেকে চোখ নামিয়ে ফেলল কলিয়া। আর তানিয়াও তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল আর দুষ্টুমিভরা মুচকি হাসি দিলো।

কলিয়া ঝুঁকে ঠোঁট বুলায়তানিয়ার গালে। তানিয়া আর দৌড়ে পালায়নি। নিস্তব্ধতা গ্রাস করল তাদের।



হঠাৎ করে দুইটা বন্দুকের গুলির আওয়াজে নীরবতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল আর পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই শব্দ।

ছোট্ট সিডার গাছের শাখায় শাখায় আলোড়ন তুলল। একটা বড় সোনালি সবুজ রঙের তিতির পাখি তাদের পায়ের কাছে এসে ধুপ করে পড়ল। তারা ভয়ে লাফিয়ে সরে গেল।

গুলিবিদ্ধ তিতিরপাখি কয়েক মুহূর্ত ঘাসের ওপরে তড়পাতে তড়পাতে স্থির হয়ে গেল। সাদা কানের আরেকটা তিতিরপাখিআকাশে উড়তে উড়তে কয়েক পাক গোত্তা খেয়ে ঠিক তানিয়ার পায়ের কাছে পড়ল।

সারি সারি দেওদার গাছের আড়াল থেকে বেরুলেন তানিয়ার বাবা। তার পিছন পিছন বেরুল ফিল্কা।

দুইজনের কাঁধেই বন্দুক ঝুলছে। নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘুরছে তাদের মাথার ওপরে।

'চমৎকার!' তানিয়ার বাবা বলে উঠলেন।

তানিয়া তার কাছে ছুটে গেল।

তানিয়াকে এখানে দেখতে পেয়ে অবাক হলেন না তার বাবা। তানিয়ার কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, 'খোকা-খুকিরা, পরীক্ষা বাদ দিও না তোমরা। বাড়িতে যাওয়ার সময় এখন।'

ভারী পাখিগুলো তুলেনিয়ে কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে রাখল ফিল্কা। ধীরে ধীরে কলিয়ার দিকে আগায় সে।

'আমরা শিকারে বের হয়েছি,' ফিল্কা বলল। 'ভোরবেলায় তিতিরপাখি খাবারের খোঁজে বের হয়।'

কলিয়া বেশ কাঁপতে লাগল। ফিল্কা তার জ্যাকেটের এক হাতা খুলে এটার একপাশ দিয়ে কলিয়ার পিঠ ঢেকে দিলো। পথ ধীরে ধীরে সরু হয়ে এলে ওদের একসাথে হেঁটে যাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ল।

তানিয়া আর তার বাবা সামনে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। তারা প্রায়কাঁধ ছুঁয়ে হাঁটছে। তানিয়ার একেবারেই ইচ্ছে হচ্ছিলনা গাছের পাতায়জমা শিশির ছুঁয়ে হাঁটতে।

তানিয়া তার বাবাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল। কত সহজেই-না তিনি শিশিরের তোয়াক্কা না করে সোজা হেঁটে চললেন। তার পায়েরনিচে মটমট করে ভেঙে পড়ে শুকনো কিছু ডাল। কোথাও তিনি থমকে দাঁড়ান না।

একজন সাধারণ মানুষ তিনি। তানিয়ার দিকে তাকিয়েতিনিহাসলেন আর তার হাত ধরে হাঁটছিলেন।

'এই সাদা অ্যাপ্রোন পরে তোমাকে ঠিক তোমার মায়ের মতো লাগছে।'

তানিয়ার বাবা এই শহরে প্রথম এসে যেমন করে তার কাঁধে হাত রেখেছিলেন, তেমন করেই তানিয়া তার বাবার কাঁধে আজ হাত রাখল। তানিয়া তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়।

'বাবা, প্রিয় বাবা!' সে বলে উঠল। 'ক্ষমা করো আমায়। তোমার সাথে কত রাগ করেছি। কিন্তু আমি এখন বুঝি। এটা তোমার দোষ নয়। এখানে দোষ না-আছে আমার, না-আছে তোমাদের, না-মায়ের। পৃথিবীতে কত মানুষই আছে যাদের ভালোবাসা যায়! তাই না বাবা?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' তার বাবা বললেন।

'আমার এমন দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা করতে পারবে? আমি আর কক্ষনো নিষ্ঠুর হবো না।'তানিয়া বলে চলল। 'কলিয়ার সাথে এই সময়ে বনেঘুরতে এসেছি দেখে কি রাগ করেছ?'

'না, না, প্রিয়। আমি জানি এই ভোরবেলায় কতটা অপূর্ব হয়ে ওঠে বন।'

****

বাইশ

বসন্ত এসে চলেও গেল। নদীর পারে পাথরের চাঁই ছুঁয়ে ঢেউ ভাঙে। দুপুর হওয়ার আগেই তপ্ত হয়ে ওঠে বালিয়াড়ি।

গ্রীষ্মে পাহাড়ের চারপাশ তেতে ওঠে।গরমের হলকা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কিছুটা ওপরে উঠে শূন্যে পাক খেয়ে উড়ে বেড়ায় ঈগল পাখি। মাঝেমধ্যে সমুদ্র থেকে বয়ে আসে মিষ্টি বাতাস আর মর্মরধ্বনিতে সাড়া দেয় বন।

শেষবারের মতো নদীতীরে হেঁটে বেড়াচ্ছে তানিয়া। বালুচরে হাঁটার সময় তার পা ছুঁয়ে বয়ে যায় নদীর ঢেউ, মনে হয় যেন শেষবারের মতো বিদায় জানাচ্ছে বন্ধুকে।

তানিয়া থমকে দাঁড়ায়। ফিল্কার সাথেকত ভোর কেটেছে এই নদীতীরে! ফিল্কা কোথায় এখন? আজ সারা সকাল তাকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে তানিয়া। পালিয়ে বেড়াচ্ছে মুখচোরাটাযাতে বিদায় জানাতে না হয়!তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এজন্য তানিয়া নিজেকেই দায়ী করছে।

এতকাল ধরে তানিয়া শুধু অবহেলাই করেছে ফিল্কাকে।তানিয়া প্রতিজ্ঞা করেছিল তার বিপদে-আপদে ফিল্কাই যেন সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে।ভীষণ লজ্জা লাগছে তার!ফিল্কা বড্ড বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল।

তানিয়া চিরকালের জন্য এই শহর ছেড়ে, ফিল্কাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ফিল্কার কথা তার বারেবারে মনে পড়ছে। পরম কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা নিয়ে ভেবে চলেছে তার কথা। তাকে খুঁজে পেতেই হবে।

'ফিল্কা! ফিল্কা!' তানিয়া গলা ছেড়ে চিৎকার করে ডাকল। ডাকপিয়নের মতো তার ডাক বহুদূরেবয়ে নিয়ে যায় চঞ্চল হাওয়া। নদীর বাঁক ঘুরতেই ফিল্কাকে দেখতে পেল তানিয়া। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে আছে ফিল্কা।

তানিয়া তার কাছে ছুটে গেল।

'মা জাহাজঘাটায় আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। আর আমি কয়েক ঘণ্টা যাবৎ তোমাকে খুঁজে মরছি,' রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'করছটা কী এখানে?'

'কিচ্ছু না,' ফিল্কা উত্তর দিলো। নানাই সুরে আরও বলল,'ছোতো-ছোতো বিশরাম।'

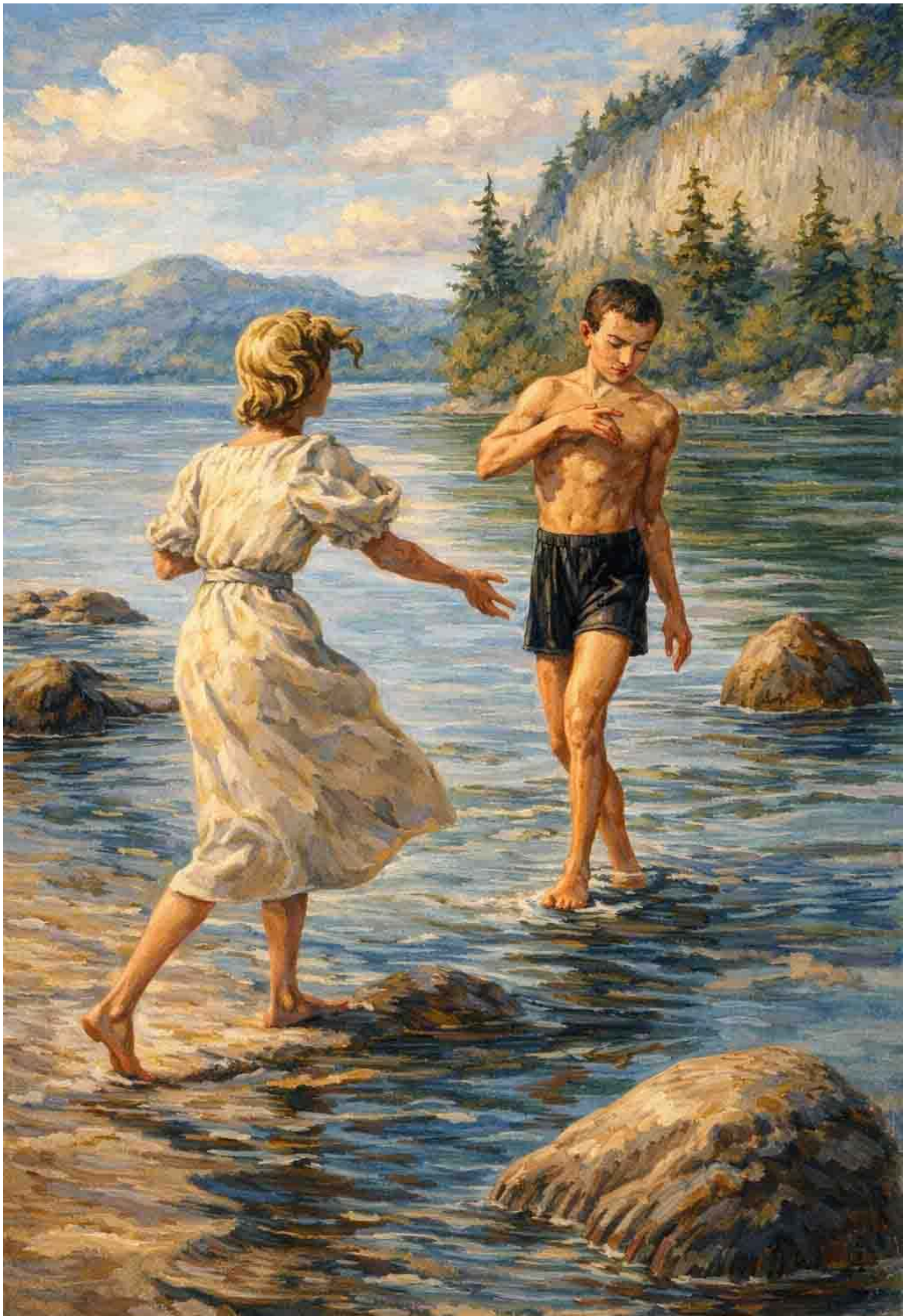
ফিল্কা প্রায় অস্ফুট স্বরে কথা বলছিল, আর বুজে আসছিল তার চোখজোড়া। বেশ বেদনাহত লাগছিল তাকে।

তানিয়া ফিল্কার দিকে চেয়ে অল্প হাসল।

'ছোতো-ছোতো' পুনরাবৃত্তি করে তানিয়া হাসল। সে আবার তাকাল ফিল্কার দিকে।

ফিল্কার গায়ে কোমর অব্দি কোনো পোশাক নেই। নদীপাড়ের শিলা পাথরের মতো চকচক করছিল তার রোদ-পোড়া বাদামি কাঁধ। তাররোদপোড়া বুকে চকচক করছিল একটা নাম।

'তা নি য়া,' শব্দ করে পড়ল তানিয়া।



ফিল্কা বিব্রতবোধ করেতার নগ্ন বুক দুই হাতের আড়ালে ঢেকে ফেলল।পিছু হটে নদীপাড়ের কিনারায় সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তানিয়া এগোল তার দিকে।

'দাঁড়াও ফিল্কা!দাঁড়াও।'

ফিল্কা দাঁড়াল।

'যদি দুটি মানুষ এত সহজেই আলাদা হয়ে যেতে পারে, তবে এভাবে দেখতে পেলেই কী আসে যায়!' ফিল্কা মনে মনে বলল।

কিন্তু তানিয়া তার দিকে তাকিয়ে ছিল না।প্রথমে সে গনগনে সূর্যের দিকে তাকাল। তপ্ত রোদে তেতে উঠেছে পাহাড়। এরপরে ফিল্কার কাছে এসে তার দুই হাতের তালু ধরে ধরে দেখল।

'এ কী! কোনো পেন্সিল নেই! কোনোচকখড়িও নেই।'তানিয়া বেশ অবাক হলো।

ফিল্কা নীরবে বালুচরে রাখা জামার ওপর থেকে তুলে নিল কাগজ কেটে বানানো তিনটে অক্ষর।

সে অক্ষর তিনটে বুকের কাছে তুলে ধরে বলতে লাগল, 'আমি রোজ সকালে এখানে আসি আরআর এই সময়ে অক্ষরগুলোবুকের কাছে রেখেসূর্যস্নান করি। বুঝলে এবার? আমার বুদ্ধি এটা। হেসো না আবার!'

ফিল্কা তার কণ্ঠমণি স্পর্শ করল। এটা তার ভাষায় দুঃখ পাওয়ার চিহ্ন, আর তানিয়া জানে তার হাসা উচিত হবে না।

একটা অব্যক্ত বেদনা নিয়ে ফিল্কার বুকে হাত রাখল তানিয়া।

'এখনোবাচ্চাই রয়ে গেলে, ফিল্কা! শীত এসে পড়লেই রোদে-পোড়া এই লেখা মুছে যাবে। তুমি তো তখন শীতের পোশাক পরে থাকবে।'

ফিল্কা ভ্রুকুটিকরে। তার হতবিহ্বল চোখজোড়া তাকায় দূরে, বালিয়াড়ি ছাড়িয়ে পাহাড়ের দিকে। পাহাড় ঘিরে সাপের মতো এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়ানদীকে সোনালি ফিতের মতো লাগছিল।তপ্ত রোদে জ্বলজ্বল করছিল নদী।

'দেখলে, কেমন বোকা আমি!'

ফিল্কা যেন নিজেকে নিয়েই বিরক্ত হয়ে উঠল।

'সূর্যের বেশ ক্ষমতা!কিছু-না-কিছু অক্ষর রয়েই যাবে। তানিয়া, তোমার কি তাই মনে হয় না?' জেদের সুরে বলল সে।

তানিয়া তার দিকে গাঢ় দৃষ্টিতে তাকাল।

'ঠিক, কিছু-না-কিছু তো রয়েই যাবে!' ফিল্কাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল সে। 'কোনোকিছুই হারিয়ে যায় না।'তানিয়ার চোখে জল এসে গেল সহসাই। সে আরও বলে চলল, 'আর যদি চলেও যায়, তাতে কী হবে বোকারাম! আমাদের বন্ধুত্বের চেয়ে দামি আর কিসে হয়!'

তারা জড়িয়ে ধরল পরস্পরকে।

তাদের শৈশব শেষ আর তারুণ্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে।কে বলতে পারে তাদের শৈশবের বেলা কেমন করে শেষ হয়ে গেল? না এই বালুচর, না এই গহন অরণ্য, এমনকি পাহাড়ঘেঁষা বহতা নদীও না।বহুদূরের কোনো মায়াবী জগৎউঁকি দিলো তাদের মনে।

কাঁধে হাত রেখে দুইজনে তাকিয়ে রইল দিগন্তের দিকে। আর চাইল না পিছনে। কতশত-না স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেখানে!

কিন্তু বিচ্ছেদের বেদনায় পুড়তে লাগল তাদের মন।

'বিদায়, ডিঙ্গো। বিদায়!'

কাঁদতে ইচ্ছে হলো ফিঙ্কার। কিন্তু তার জন্ম অরণ্যে, যেখানে করাল সাগরের ঢেউ চুমু খায় ধু-ধু সমুদ্রতীরে।বালুচরে দাঁড়িয়ে রইল ফিঙ্কা আর তানিয়া নদীতীর ধরে হেঁটে চলল জাহাজঘাটার দিকে।

তানিয়ার মুখে ঝাপটা দেয় সমুদ্র বয়ে আসা তীব্র নোনা বাতাস।

*********** সমাপ্ত***********

উত্তরভাষ

পুঁজিবাদের অধীনে মানুষের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে। বাবা-মা লড়াই করেন তাঁদের সন্তানদের জীবনের জন্য, সন্তানরা লড়াই করে তাদের উত্তরাধিকারের জন্য। একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিজের দোকানের লাভের জন্য আরেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সঙ্গে লড়াই করে এবং উভয়েই লড়াই করে বৃহৎ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। সবাই যেন এক যুদ্ধাবস্থায় : গ্রামবাসী শহরবাসীর বিরুদ্ধে, ছাত্র শিক্ষককের বিরুদ্ধে, জনগণ আমলাদের বিরুদ্ধে, কারখানা ব্যাংকের বিরুদ্ধে, কর্পোরেশন কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে।

সমাজতন্ত্রের অধীনে প্রতিটি মানুষই শান্তিপূর্ণ মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে। 'প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে' এই লড়াইয়ের বদলে শুরু হয় 'সবার জন্য সবার সংগ্রাম'। যারা সমাজের জন্য উপকারী, তারা নিজের জন্যও উপকারী হয়ে ওঠে। যারা নিজের জন্য উপকারী, তারাই সমাজের উপকার সাধন করে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। নতুন নতুন আবিষ্কার ভয় ও আশঙ্কা নয়, বরং আনন্দ ও আশার প্রেরণা জাগায়।

–বার্থোল্ট ব্রেখ্ট, জার্মান নাট্যকার ও কবি, ১৯৫৫

যখন 'বুনো কুকুর ডিঙ্গো বা প্রথম প্রেমের গল্প' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়, কিছু সমালোচক লেখাটিকে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন বলে অভিযুক্ত করেন। তাদের মতে, ফ্রাইয়ারমান গল্পের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। আরও সুস্পষ্ট করে বললে, কাহিনির স্থানগুলোতে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, তিনি সেগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখাননি।

ফ্রাইয়ারম্যান সত্যিই ইচ্ছাকৃতভাবে অক্টোবর বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের পর রাশিয়ায় সংঘটিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলির ওপর আলোকপাত করেননি।

যদি ফ্রাইয়ারম্যান সংবাদপত্রে কোনো প্রবন্ধ বা নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র লিখতেন, তবে এমন সমালোচনা যুক্তিযুক্ত হতো।

কিন্তু ফ্রাইয়ারম্যান মূলত একটি ফিকশন লিখছিলেন। ফিকশনের ন্যারেটিভ প্রবন্ধের থেকে আলাদা, তাই আমরা সমালোচকদের সঙ্গে একমত হতে পারি না।

একজন লেখক বা একজন ঔপন্যাসিক যখন আমাদের চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলেন, তখন তিনি শুধু এই চরিত্রগুলোর গল্পই বলেন না; একজন প্রকৃত শিল্পীর মতো সেই সমাজ সম্পর্কেও বলেন। লেখক সেই সমাজের লিখিত আইন যেমন বর্ণনা করেন, তেমনি অলিখিত নিয়মগুলিও শৈল্পিক ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলেন। একই সঙ্গে তিনি পরোক্ষভাবে অন্য লেখকদের সঙ্গে বিতর্কে যুক্ত হন–যারা অতীতে তাদের গল্প বলেছেন এবং যারা ভবিষ্যতেও বলবেন।

মহান লেখকদের ভালো উপন্যাসগুলো প্রায়ই গোয়েন্দা কাহিনির মতো মনে হয়। এখানে আমি আগাথা ক্রিস্টি, চেস্টারটন, জে. কে. রাউলিং বা স্টিফেন কিং-এর মতো লেখকদের তৈরি মধ্যমমানের বাণিজ্যিক থ্রিলারসাহিত্যের কথা বলছি না (যদিও আমি শেষোক্ত লেখকের কিছু ভালো গল্প পড়েছি)।

গভীর সাহিত্য রচনার কিছু নির্দিষ্ট আইন বা নিয়ম থাকে, যা পাঠকের মনে রাখা উচিত।

১. পাঠককে চরিত্রদের কথার প্রতি সংশয়ী হতে হবে এবং তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি মনোযোগী হতে হবে।

২. একজন বুদ্ধিমান লেখক বুদ্ধিমান পাঠককে সম্মান করেন এবং একজন বুদ্ধিমান লেখক প্রায় সবসময় তার রচনা বহুস্তরের কাঠামোতে নির্মাণ করেন।

একটি স্তর থাকে বাহ্যিক–সাধারণ পাঠকদের জন্য, যে কেবল কাহিনি পাঠ করে এবং গূঢ় অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়।

অন্য স্তরটি গভীর। এই স্তরটি লেখক তৈরি করেন পর্যবেক্ষণশীল ও চিন্তাশীল পাঠকের জন্য; চিন্তাশীল পাঠককে সতর্কভাবে এই গোপন স্তর বা স্তরগুলো অনুসন্ধান করতে হয়।

উদাহরণ হিসেবে গোগলের উপন্যাস (কবিতা) 'মৃত আত্মা' এর কথা বলা যেতে পারে। সাধারণ পাঠকের কাছে এটি এক প্রতারকের অভিযানের একটি সাধারণ চিত্রানুগ (picturesque) উপন্যাস। কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পাই–অর্থনৈতিক লাভের ওপর নির্মিত একটি সমাজ কীভাবে ধীরে ধীরে নরকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সেই নিয়ে এক প্রলয়ংকরী ও নারকীয় নাটক (infernal drama)।

আরেকটি উদাহরণ : শেকসপিয়রের নাটক 'হ্যামলেট'।

প্রথম দৃষ্টিতে এটি একেবারে সাধারণ একটি অ্যাকশন থ্রিলারের মতো : এক বিশ্বাসঘাতক চাচা এক তরুণ, অভিজাত বংশীয় যুবকের কাছ থেকে সিংহাসন কেড়ে নেয়। তরুণ হ্যামলেটের চাচা ক্লডিয়াস হ্যামলেটের পিতা–মহান শাসক হ্যামলেট দ্য এল্ডারকে হত্যা করে।

হ্যামলেট দ্য ইয়ংগার যখন তার চাচার অপরাধের কথা জানতে পারে, তখন সে প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। চাচার সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে সে তার 'ন্যায্য' প্রতিশোধ নেয়। এই প্রতিশোধের যাত্রায় সে তার সব শত্রুকে ধ্বংস করে, কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজেও সে মারা যায়।

কিন্তু আমরা যদি দার্শনিকের দৃষ্টিতে এই আখ্যানটি আরও গভীরভাবে দেখি, তবে টের পাই–নাটকটি আসলে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছুর কথা বলছে।

রক্তপিপাসু স্বৈরাচারী ও বিকৃত রুচির মানুষ হ্যামলেট দ্য এল্ডার বহু আগেই ডেনিশ রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক ফোর্টিনব্রাস দ্য এল্ডারকে হত্যা করে। হ্যামলেট দ্য এল্ডার সিংহাসন দখল করে এবং ফোর্টিনব্রাস দ্য এল্ডারের স্ত্রী গার্ট্রুডকে নিজের করে নেয়।

হ্যামলেট দ্য এল্ডারের বেপরোয়া কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যায়। হ্যামলেট দ্য এল্ডারের বিবেকবান ও দূরদর্শী ভাই ক্লডিয়াস এই বিপর্যয় আগেই অনুমান করেন এবং রাষ্ট্রকে রক্ষা করার আশায় স্বৈরাচারী হ্যামলেট দ্য এল্ডারকে হত্যা করে তার স্ত্রী গার্ট্রুডকে অধিকার করেন। কিন্তু তখন হ্যামলেট দ্য এল্ডারের উত্তরাধিকারী হিসেবে হ্যামলেট দ্য ইয়ংগারের আবির্ভাব ঘটে এবং সিংহাসনের জন্য সংগ্রাম শুরু করে।

শেষপর্যন্ত সে এমন এক রক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞ চালায়, যাতে প্রায় সব চরিত্রই নিহত হয়। রাষ্ট্র শাসকহীন হয়ে পড়ে এবং সিংহাসন ফিরে যায় প্রকৃত অধিকারী ফোর্টিনব্রাস দ্য ইয়ংগারের হাতে–যিনি নিহত ফোর্টিনব্রাস দ্য এল্ডারের উত্তরাধিকারী।

এ যেন এক জাদু! একই সাহিত্যকর্ম, কিন্তু আমরা এটিকে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বইয়ের মতো পড়তে পারি, যাদের মধ্যে যেন কোনো সাধারণ সূত্রই নেই।

এটাই হচ্ছে 'ক্রিয়েটিভ রাইটিং'।

গভীর সাহিত্য সম্পর্কে উপর্যুক্ত দুটি নিয়মের সঙ্গে আমরা তৃতীয় একটি নিয়ম যোগ করব।

৩. একটি ভালো সাহিত্যকর্ম অবশ্যই পুনর্পাঠযোগ্য হতে হবে।

শৈশবে যখন আমরা গোগল, শেকসপিয়র, পুশকিন প্রমুখের বই পড়ি, তখন ইতিহাস ও জীবনকে দেখি আমাদের শিশুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে, ভাসাভাসা চোখে।

কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে, সেই একই বইয়ের আরেকটি স্তর আমাদের দেখতে পাওয়া উচিত।

আমি যখন ছোটবেলায় ফ্রাইয়ারমানের উপন্যাস 'বুনো কুকুর ডিঙ্গো' পড়েছিলাম, তখন বইটিকে বিশেষ কিছু মনে হয়নি। এটি কিশোর উপযোগী সাধারণ একটি গল্প। এখানে বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরীরদের পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও তাদের মিথস্ক্রীয়ার কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের জানান দেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে স্কুলপড়ুয়া শিশুদের জন্য অবিশ্বাস্যভাবে বিশাল পরিসরে সাহিত্যভান্ডার ছিল। এই কথাসাহিত্য সোভিয়েত কিশোরদের কাছে বহুবিধ জগৎ তুলে ধরত–টিনএজারদের পারস্পরিক জটিল সম্পর্ক, সমবয়সিদের সঙ্গে সম্পর্ক, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সম্পর্ক, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি। এই সাহিত্য কিশোরদের শিক্ষিত করত, সোভিয়েত কিশোরদের আচরণকে জটিল, বহুবিধ ও সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করে তুলত, যার দরুন বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত ও বহুরূপী সমাজ গড়ে ওঠে।

আর যদি আমরা ফ্রাইয়ারমানের বইটিকে এমন সোভিয়েত নৈতিক ও শিক্ষামূলক সাহিত্যের প্রথমদিকের উদাহরণগুলোর একটি হিসেবে দেখি, তাহলে এটি তুলনামূলকভাবে বেশ সরল একটি কাজ বলেই মনে হয়।

কিন্তু আজ এই বইটি আবার পড়লে, আমি এতে আরেকটি স্তর দেখতে পাই। আর তা হচ্ছে সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর। এছাড়াও রুভিম ফ্রাইয়ারমান সোভিয়েত সমাজের দ্বিতীয় দশক সম্পর্কে আমাদের জন্য রেখে গেছেন এক মূল্যবান তথ্য।

এই রচনার প্রধান চরিত্রদের দিয়েই শুরু করা যাক। প্রথমদৃষ্টিতে তাদের সাধারণ সোভিয়েত স্কুলপড়ুয়া শিশু বলে মনে হয়। কিন্তু ফ্রাইয়ারমান বুঝতেন যে তিনি সাধারণ মানুষের গল্প লিখছেন না; তিনি লিখছেন সোভিয়েত মানুষের প্রথম প্রজন্ম সম্পর্কে–যারা নতুন সোভিয়েত সমাজে জন্মেছে এবং সোভিয়েত স্কুলে সম্পূর্ণ সোভিয়েত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে।

আর একজন প্রাজ্ঞ লেখক হিসেবে ফ্রাইয়ারমান বুঝতেন, এই জীবন সহজ হবে না। নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সন্তানদের বৈশ্বিক পুঁজির সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হবে।

এই শিশুদের পিতারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল এবং গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। আর এই শিশুরা স্কুল শেষ করার পরপরই মহান পিতৃভূমির যুদ্ধে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে) অবতীর্ণ হবে হিটলারের ইউরোপীয় ইউনিয়নকে পরাজিত

করতে এবং যুদ্ধের পর প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী ও শ্রমিক হয়ে উঠবে। নির্মাণ করবে বিশ্ব-ইতিহাসের সবচেয়ে গতিশীল ও বিকাশমান এমন এক সমাজ যার কাঠামো হবে পৃথিবীর সবচেয়ে ন্যায্য।

আমি সেই সমাজকে বলি প্রগতিশীল (ক্রমাগত) উন্নয়নের সমাজ এবং যৌথ অগ্রগতির সমাজ।

আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি?

এ ছিল এমন এক সমাজ, যেখানে দেশ পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নত হতো এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠত। এই সমাজে খনি, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ইস্পাত কারখানা, টেক্সটাইল শিল্প–এসব গড়ে তোলা হতো কোনো পুঁজিপতির মুনাফা অর্জনের জন্য বা প্রতিদ্বন্দ্বীর কারখানা ধ্বংস করার জন্য নয়। ইউএসএসআর-এ সমস্ত কারখানা, শহর, সড়ক, স্কুল ও হাসপাতাল নির্মিত হয়েছিল দেশের জন্য এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষের উন্নয়নের জন্য।

যেকোনো পুঁজিবাদী সমাজে কোনো প্রতিষ্ঠানের আয়ের ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ চলে যায় পুঁজিবাদী প্রভু–মালিকদের, শেয়ারহোল্ডারদের পকেটে। কিন্তু সোভিয়েত সমাজে সমস্ত আয় চলে যেত রাষ্ট্রের কাছে। আর এর ফলে এমন একটি দেশ, যার আবহাওয়া ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বৈরী, যার দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা ছিল চিরস্থায়ী বরফে আচ্ছাদিত, সে-দেশ সম্ভব করেছিল শহর ও গ্রাম গড়ে তুলতে, সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও মেরু এলাকা অনুসন্ধান করতে, আর সেখানে তেল ও গ্যাস উত্তোলন এবং শহর নির্মাণ করতে পেরেছিল।

আশি'র দশকে, উদারপন্থি অর্থনীতিবিদদের দেবী বলে পরিচিত মার্গারেট থ্যাচার বলেছিলেন যে ইউএসএসআর-এর ভূখণ্ডে দেড় কোটি মানুষের বসবাস করাই যুক্তিসংগত হবে। পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ঠিকই ছিলেন। কিন্তু ইউএসএসআর-এর শেষ সময়ে জনসংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ কোটি, যাদের ছিল ভালো বাসস্থান, উচ্চমানের অবৈতনিক শিক্ষা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, অত্যন্ত কমমূল্যে ইউটিলিটি, খাদ্য ও পরিবহন সেবা, কর্মসংস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

কারণ ইউএসএসআর নিজের সম্পদ ব্যবহার করেছিল এবং সেখানে কোনো শোষকশ্রেণি ছিল না, তাই আমাদের দেশ বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা জ্বালানি সরবরাহ করতে পেরেছিল এবং ফলস্বরূপ সাইবেরিয়া ও আর্কটিকে শহর নির্মাণ করতে পেরেছিল। এ কারণেই পুঁজিপতিরা ইউএসএসআর-কে এত ভয় করত এবং ঘৃণা করত।

ইউএসএসআর-এর অস্তিত্বের কারণে পুঁজিপতিরা বাধ্য হয়েছিল নিজেদের দখল করা মুনাফা কমাতে এবং তাদের সমাজের সামাজিক মানদণ্ড ইউএসএসআর-এর মানদণ্ডের কাছাকাছি আনতে। ইউএসএসআর ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বে নতুন একটি পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লব শুরু হয়, অলিগার্কদের আয় আবার আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে এবং সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে আবার পুঁজিপতিদের দাসে পরিণত করা শুরু হয়।

অনেক ভালো ভালো বই লেখা হয়েছে সোভিয়েত অর্থনীতি নিয়ে। আমি বিশেষভাবে দু'টি বইয়ের কথা সুপারিশ করতে পারি, যেগুলো খুব পরিষ্কার ও সহজ ভাষায় লেখা : Кристалл роста (The Growth Crystal), লেখক আলেক্সান্দার গালুশকা; এবং Почему Россия не Америка (Why Russia Is Not America), লেখক আন্দ্রেই পারশেভ।

সোভিয়েত অর্থনীতি ও ইউএসএসআরের সামাজিক কাঠামো নিয়ে আমি বেশি কিছু লিখব না, কারণ তা লিখতে গেলে ফ্রাইয়ারমানের উপন্যাসের চেয়েও বড় একটি বই লেখা হয়ে যাবে।

আমি শুধু কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করব, যেগুলো আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় এবং যা আপনাকে ইউএসএসআরকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

ফ্রাইয়ারমানের গল্পটির প্লট ১৯৩০-এর দশকে রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যে (Far East)। বাস্তবে এটি সাইবেরিয়ার প্রান্তবর্তী অঞ্চল। সাইবেরিয়া হলো রাশিয়ার অত্যন্ত বৈরী জলবায়ুর এশীয় অংশ, যা উরাল পর্বতমালার পূর্বদিকে অবস্থিত। এই অঞ্চলে জনবসতি অত্যন্ত কম।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের আগে ইউরোপীয় রাশিয়ার জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ১৩ কোটি, আর সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্যের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি। অথচ সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্যের আয়তন ছিল ইউরোপীয় রাশিয়ার তুলনায় তিন থেকে চার গুণ বড়। তবুও এই বিশাল অঞ্চলে তখন উন্নয়নের ছোঁয়া খুব একটা লাগেনি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্যের অধিকাংশ বাসিন্দারা তাদের সারাজীবনে কখনো কোনো শিক্ষক বা ডাক্তার দেখেননি।

আমার মতে, আকিরা কুরোসাওয়া'র শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রটির নাম 'দেরসু উজালা'।

রুশ লেখক, সামরিক কর্মকর্তা ও অভিযাত্রী ভ্লাদিমির আরসেনিয়েভের অভিযানের একটা গল্পের রূপান্তর হলো 'দেরসু উজালা'। তাঁর লেখাগুলোতে তিনি রুশ দূরপ্রাচ্যের অধিবাসীদের বিপ্লব-পূর্ব যুগের অবিশ্বাস্য কঠোর ও চরম দারিদ্র্যময় জীবনকে জীবন্তভাবে চিত্রিত করেছেন।

১৯০৬-১৯০৭ সালের অভিযানে ভ্লাদিমির আরসেনিয়েভের সঙ্গী ছিল নানাই শিকারি–দেরসু উজালা। একজন শিকারি, অনুসন্ধানকারী, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিল সে। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল চরিত্রও বটে। কর্মকর্তা ভ্লাদিমির আরসেনিয়েভ তাকে নিজের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করতেন। তবুও, দেরসু উজালা এক ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবেই থেকে যায়।

তার বুদ্ধিমত্তা থাকা সত্ত্বেও, তরুণ দেরসু কোনো শিক্ষা লাভ করেনি। সে ছিল নিরক্ষর। যৌবনে তার একটি ছোট ঘর ছিল, স্ত্রী ও সন্তান ছিল। দেরসুকে নিরন্তর শিকারের পিছনে ছুটতে হতো; নচেৎ তার পরিবারকে অনাহারে দিনাতিপাত করতে হতো। কখনো কখনো ব্যবসায়ীরা তাকে ঠকাত, কম দামে পশম কিনে নিত অথবা নিম্নমানের পণ্যের বিনিময়ে লেনদেন করত। একসময় মহামারী দেখা দেয়, এবং তার স্ত্রী ও সন্তানরা মারা যায়।

এরপর দেরসু যাযাবর জীবন শুরু করে। প্রতিদিন সে শিকারে বের হয়। যদি সে তাইগায় কোনো হরিণ বা বন্য শূকর শিকার করতে না পারে, তবে তাকে অনাহারে থাকতে হবে। যদি ক্ষুধার্ত শিকারি শিকার করতে না পারে–আর তার অর্থ হচ্ছে 'মৃত্যু'। অসুস্থতা শিকারির কাছে মৃত্যুসম। আর কোনো অসাধু ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাতের মানে হচ্ছে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার পথ বেছে নেওয়া। আর তা-ও শেষপর্যন্ত মৃত্যুর দিকেই ধাবিত করে।

আরসেনিয়েভের অভিযাত্রী দলটির সঙ্গে দেরসুর সাক্ষাৎ হলে তাকে কয়েক মাসের জন্য হলেও ক্ষুধা ও মৃত্যুকে ভুলে থাকার সুযোগ দেয়। কিন্তু বার্ধক্য ও দৃষ্টিশক্তির অবনতির ফলে দেরসু অক্ষম হয়ে পড়ে। ভ্লাদিমির আরসেনিয়েভ দেরসুকে শহরে নিয়ে এসে নিজের শহরের বাড়িতে আশ্রয় দেন। কিন্তু শহরে দেরসুর ওপর নেমে আসে ভিন্ন ধরনের দুর্ভাগ্য। সে শহুরে জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। এক আদিম ও নিরক্ষর মানুষ হিসেবে সমাজের প্রচলিত আইন-কানুন ও নিয়মের কাছে সে নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করে; সে যেন খাঁচায় বন্দি কোনো প্রাণী।

অবশেষে দেরসু তাইগায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ১৯০৮ সালে ফেরার পথে পলাতক কয়েদিদের হাতে সে লুট ও খুনের শিকার হয়।

দেরসু উজালা জন্মগ্রহণ করেছিল ১৮৪৯ সালে; আর তার মৃত্যু হয় ৫৯ বছর বয়সে।

দেরসুর জন্মের ২১ বছর পর জন্ম নেন উলুকিতকান। উলুকিতকান ছিলেন এক তাইগা-শিকারি ও পথপ্রদর্শক, যিনি বহু বছর রুশ ভূতত্ত্ববিদ ও ভূমি-জরিপকারীদের সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে উলুকিতকান মহান

সোভিয়েত মানচিত্রকার ও লেখক গ্রিগরি ফেদোসিয়েভ-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রায় সেইসব স্থানেই ভ্রমণ করেন, যেখানে আগে দেরসু উজালা ও ভ্লাদিমির আরসেনিয়েভ গিয়েছিলেন এবং যেখানে ফ্রাইয়ারমানের গল্পের নায়ক ফিলকার পরিবার বাস করত।

খুব সম্ভব, উলুকিতকান দেরসু উজালা ও ফিলকার বাবা-মাকে দেখেছিলেন। তাঁরা একই সামাজিক স্তরের মানুষ, একই অঞ্চলের বাসিন্দা এবং একই ধরনের পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের ভাগ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

দেরসু উজালা আমাদের দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদের শাসনামলে তাইগার শিকারিরা কীভাবে জীবনযাপন করত। মানুষকে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য একাই লড়তে হতো। তাদের শ্রমের ফল মাংস, চামড়া, পশম অসৎ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বিক্রি হতো।

সেই সমাজে শিক্ষা ও চিকিৎসা কার্যত ছিল না বললেই চলে। বাসস্থান বলতে ছিল কেবল তাঁবু যা শিকারিরা নিজেরাই তৈরি করত। বেঁচে থাকার সামান্য সুযোগ পাওয়ার জন্য শিকারিরা দুই বা তিনটি পরিবারের ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বসবাস করত। এমন দলগুলোর টিকে থাকার সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি ছিল। একা একজন মানুষ তাইগার সব বিপদ ও রোগব্যাধির মুখোমুখি হতো। আবার যেখানে উৎপাদন সামান্য, সেখানে বড় কোনো দল সবসময় অনাহারের ঝুঁকির প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকত।

ফ্রাইয়ারমানের গল্পের নানাই বালক ফিলকা দেরসু উজালা'র মতোই ভাগ্য বরণ করতে পারত, যদি না অক্টোবর বিপ্লব ঘটত। বাস্তবে বিপ্লবের আগে যাযাবর বা স্থায়ী শিকারি ও হরিণপালক–নানাই, ইভেংক, চুকচি এবং দরিদ্র রুশ কৃষকদের (মুঝিক) জীবনযাত্রার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ছিল না।

আমার পূর্বপুরুষেরা যারা ভূমির অভাব ও চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষের কারণে ১৯১০ সালে বেলারুশ থেকে আলতাই অঞ্চলে পাড়ি জমান এবং কুচুক নদীর তীরে একটি ছোট গ্রামে বসবাস করতেন, তাদের জীবনও আর্কটিক মহাসাগরের উপকূলে বসবাসকারী চুকচি শিকারিদের তুলনায় খুব বেশি উন্নত ছিল না।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আলতাইয়ের কৃষক বা চুকচি শিকারিদের কারওই হাসপাতাল, বিদ্যালয়, নিয়মিত মজুরি, পেনশন বা বেতনসহ ছুটি ছিল না। হ্যাঁ, চুকচি বসতিগুলোতে কঠোর নিয়ম চালু ছিল। জনশ্রুতি আছে, দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষের সময় চুকচি শিকারিরা তাদের বৃদ্ধদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করত এবং এটিকে নাকি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ঘটনা হিসেবে ধরা হয়। বয়োজ্যেষ্ঠরাই অনুরোধে করতেন তাদেরকে মেরে ফেলার জন্য, যাতে তাঁদের তরুণ উত্তরসূরিরা বেঁচে থাকার সুযোগ পায়।

কিন্তু আমার দাদি বলতেন, রুশ গ্রামগুলোতেও বৃদ্ধদের আত্মহত্যা অস্বাভাবিক ছিল না। কোনো একদিন একজন বৃদ্ধ হয়তো খাওয়া বন্ধ করে দিতেন। এমনটা ঘটত যখন পরিবার চরম দারিদ্র্যে পড়ত বা ফসল নষ্ট হতো। অর্থোডক্স চার্চ আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করেছিল, তাই বৃদ্ধরা শুধু বলতেন যে তাদের খেতে ইচ্ছে করছে না বা তারা অসুস্থ বোধ করছেন। এক সপ্তাহ খাবার খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার পর সেই বৃদ্ধ নীরবে মৃত্যুবরণ করতেন পরবর্তী ফসল ওঠা পর্যন্ত উত্তরাধিকারীদের টিকে থাকার সুযোগ করে দিয়ে।

অক্টোবর বিপ্লবের পর সমগ্র সোভিয়েত সমাজে প্রগতিশীল পরিবর্তন শুরু হয়। উত্তরাঞ্চলের যাযাবর ও তাইগার শিকারিদের জীবনেও পরিবর্তন আসে। তুন্দ্রা ও তাইগা–উভয় অঞ্চলে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ শিকারি ও হরিণপালকদের জন্য ঘাঁটি স্থাপন করতে শুরু করে, যেখানে তারা তাদের পণ্য : চামড়া, মাংস, পশম–রাষ্ট্রের কাছে ন্যায্যদামে বিক্রি করতে পারত। এসব ঘাঁটিতে দোকান, বিদ্যালয়, চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা কেন্দ্রও ছিল। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে সবকিছু বেশ প্রাথমিক পর্যায়ের ছিল, কিন্তু তবুও তা শিকারি ও হরিণপালকদের অনাহার থেকে বাঁচার, চিকিৎসা পাওয়ার এবং ন্যূনতম শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেয়।

১৯৫০-এর দশকে গ্রিগরি ফেদোসিয়েভ উলুকিতকান ও তাঁর পরিবারের জীবন সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন, তা দেখায় তাঁদের জীবন কতটা বদলে গিয়েছিল। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে তাইগার শিকারিদের ইতোমধ্যেই গ্রামে স্থায়ী বাসস্থান ছিল। আর তাইগায় যাযাবর জীবন তখন কেবল একটি বেতনভুক্ত নিয়মিত পেশা। শিকারিরা নির্দিষ্ট সময় পরপর বসতিতে ফিরে আসত, তাদের উৎপাদিত দ্রব্য জমা দিত এবং মজুরি পেত। তারা বিশ্রামের পাশাপাশি চিকিৎসা সুবিধা এবং নিয়মিত বেতনসহ ছুটি ভোগ করতে পারত। যাযাবরদের সন্তানরা বিদ্যালয় বা আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত, ফলে তারা যাযাবর জীবনের কষ্টসাধ্য জীবন ত্যাগ করে চালক, পশুচিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, বিজ্ঞানী, লেখক প্রভৃতি পেশায় যাওয়ার সুযোগ পেত।

তবে, এবারে চলুন ফিলকার প্রসঙ্গে ফিরে যাই, যার জীবন নিয়ে ফ্রাইয়ারমান লিখেছিলেন। সেই সময় যাযাবর শিকারি ও হরিণপালকদের জন্য স্থায়ী বিদ্যালয় বা আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ফ্রাইয়ারমানের গল্প থেকে আমরা জানতে পারি, এই মানুষদের জীবন ইতিমধ্যেই বদলে যেতে শুরু করেছিল।

ফিলকার বাবা তার ছেলেকে শহরে পাঠান, থাকার জন্য বাড়ি ভাড়া করেন এবং তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। এর অর্থ যাযাবরদের জীবন ও মানসিকতায় ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। ফিলকার বাবার নিয়মিত আয় ছিল। তাই তিনি নিয়মিতভাবে ছেলের বাসস্থান, খাদ্য ও পোশাকের খরচ জোগাতে পারতেন। আর ফিলকা তার বাবাকে প্রতিদান দেয় আদর্শ আচরণ ও ভালো ফলাফলের মাধ্যমে।

আমরা লক্ষ করি–ফিলকার মানসিকতা ইতোমধ্যেই বাবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার বাবা শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান মানুষ, কিন্তু তার অনুভূতিগুলো তুলনামূলকভাবে সরল ও অকৃত্রিম। অন্যদিকে ফিলকা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি জটিল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সে বুদ্ধিমান, পর্যবেক্ষণশীল; তার আচরণে এসেছে সূক্ষ্মতা, কোমলতা ও বিবেচনাবোধ। নিঃসন্দেহে এটি শিক্ষা ও সমৃদ্ধ সামাজিক জীবনের ফল।

কয়েকবছর পর সে এই যাযাবর শিকারির উত্তরসূরি এক যোদ্ধা হয়ে উঠবে, বিজয়ী হবে ১৯৪১-১৯৪৫ সালের মহান যুদ্ধে। যুদ্ধের পর ফিলকা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে এবং প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক কিংবা ভূতত্ত্ববিদ হবে। আমার কাছে স্পষ্ট–ফিলকা ব্যক্তিগত জীবনেও ভীষণ সুখী হবে।

প্রাপ্তবয়স্ক ফিলকা হবে এক আদর্শ মানুষ–যোদ্ধা, বিজ্ঞানী, নায়ক। সেই ধরনের মানুষ, যার প্রতি নারীরা আকৃষ্ট হয়। ত্রিশ বছর বয়সে ফিলকার একজন স্ত্রী থাকবে, যে তাকে নিয়ে গর্ব করবে, হবে তার বন্ধু ও সহযোদ্ধা (Comrade) এবং রুশরা যাকে বলে 'রিয়ারগার্ড'।

তুর্কি কবি নাজিম হিকমত সুখের সংজ্ঞা ঠিক এভাবে দিয়েছেন :

> 'সুখ হলো যখন সকালে সত্যিই কাজে যেতে ইচ্ছে করে এবং সন্ধ্যায় সত্যিই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে।'

আমি নিশ্চিত–ফিলকা ঠিক এমনই সুখ অনুভব করবে।

উপসংহার টেনে দেওয়ার আগে চলুন রুভিম ফ্রাইয়ারমান তাঁর গল্পে যে সামাজিক জীবনের চিত্র এঁকেছেন, সে বিষয়ে কিছু কথা বলি।

বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যের জীবন নিয়ে লেখা বই পড়লে আমার মনে সবসময় একধরনের দ্বৈত অনুভূতি হতো। সাংবাদিক ডেভিড শ্রেইডার, জেনারেল আলেক্সান্দর ভেরেশচাগিন এবং অভিযাত্রী ভ্লাদিমির আরসেনিয়েভ'র মতো লেখকেরা এমন এক জীবন বর্ণনা করেছেন, যা ছিল অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর! বিপদ আর অনিশ্চয়তায় ভরা অভিযান। সাধারণ রুশ কৃষক, ব্যবসায়ী ও তাইগার শিকারিরা এমন এক জীবনযাপন করত, যা অনেকাংশে রবিনসন ক্রুসোর জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঐসব অঞ্চলে এক বসতি থেকে আরেক বসতিতে যেকোনো যাত্রাই যেন ছিল এক চরম, বিপজ্জনক ও কঠিন অভিযাত্রা।

আপনি যখন উষ্ণ ঘরে বৈদ্যুতিক বাতির পাশে বসে গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে এইসব অভিযান পড়েন, তখন সেগুলো আকর্ষণীয় ও মনোরম বলে মনে হয়। কিন্তু যদি নিজেকে সেই কৃষকের জায়গায় কল্পনা করেন, যে বছরের-পর-বছর বিরামহীনভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে, কয়েক দশক ধরে প্রতিনিয়ত বিপদ, দুর্যোগ, রোগব্যাধি বা ফসলহানির আশঙ্কা নিয়ে বেঁচে আছে, তখন বোঝা যায় কেন ইতিহাসবিদ লেওনিদ মিলোভ তাঁর বই Великорусский пахарь (The Great Russian Plowman)-এ উল্লেখ করেছেন যে রুশ কৃষকদের মধ্যে মানসিক রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিল এবং এটি ছিল রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশে, যেখানে আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে অনুকূল ছিল এবং কিছু সামাজিক কাঠামো ও সড়ক-যোগাযোগও বিদ্যমান ছিল। বিপ্লবের আগে দূরপ্রাচ্য ছিল কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার অংশ। সরু রেলপথের এক সুতোয় বাঁধা, দূরপ্রাচ্যকে প্রকৃত অর্থে রুশ বলা যেত শুধু রেললাইন ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল বরাবর। তাইগার গভীরে, রেলপথ থেকে বহু দূরের বসতিগুলোর বাইরের বিশ্বের সঙ্গে বছরের-পর-বছর কোনো যোগাযোগই ছিল না।

ফ্রেয়ারমানের গল্পের মূল্য এখানেই যে তিনি দেখিয়েছেন–কীভাবে সোভিয়েত সভ্যতা দেশের সবচেয়ে প্রত্যন্ত কোণেও প্রবেশ করছে। যেখানে তানিয়া সাবানেয়েভা ও তাঁর মা বাস করেন, সেই শহর আর কোনো রবিনসন-ধাঁচের বিচ্ছিন্ন বসতি নয়। এটি একটি স্বাভাবিক রুশ শহর। সেখানে হাসপাতাল আছে, স্কুল আছে, শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে। সড়ক ও যোগাযোগব্যবস্থার মাধ্যমে এটি অন্যান্য বসতির সঙ্গে সংযুক্ত। সেখানে একটি বন্দর আছে, কাছেই সামরিক ঘাঁটি আছে এবং মস্কোর খ্যাতনামা লেখকেরা শহরে আসেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গ্রীষ্মকাল কাটায় পাইওনিয়র ক্যাম্পে।

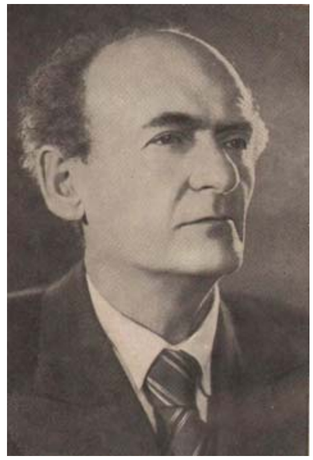
সম্ভবত লেখকের সবচেয়ে মূল্যবান পর্যবেক্ষণ হলো–তিনি আমাদের দেখান যে দেশের একেবারে প্রান্তে অবস্থিত একটি দূরবর্তী শহরও সেই দেশেরই অংশ এবং সেখানকার বাসিন্দারা কোনো রবিনসন ক্রুসো নন, দুর্ধষ কোনো অভিযানের অনুরাগীও নন; তারা একেবারেই সাধারণ মানুষ, যারা সোভিয়েত মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে।

এই মানুষগুলো পড়াশোনা করে, পড়ায়, চিকিৎসাসেবা দেয়, বাড়ি নির্মাণ করে, পশমের জন্য শিকার করে, সাংবাদিকতা করে, সীমান্ত রক্ষা করে, স্বপ্ন দেখে, বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। তারাই গড়ে তুলছে নবীন সোভিয়েত ইউনিয়ন।

–ইয়েভগেনি ভিক্তরোভিচ স্পিরিন

সোসনোভোবরস্ক, ক্রাসনোইয়ার্স্ক অঞ্চল, রাশিয়া

লেখক পরিচিতি



রুভিম ফ্রেয়ারম্যান (২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ- ২৮ মার্চ, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ)

সোভিয়েত কথাসাহিত্যিক রুভিম ফ্রেয়ারম্যান ছিলেন সমাজতান্ত্রিক রোমান্টিসিজম ধারার অন্যতম পুরোধা। তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন অনেক পেশার সাথে। শিক্ষক, সাংবাদিক, যোদ্ধা, জেলে। তাঁকে লাল ফৌজের প্রতিনিধি হিসেবে সাইবেরিয়া অঞ্চলে প্রেরণ করা হয় যাতে এ অঞ্চলকে তিনি বলশেভিক বলয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। কাজের সুবাদে এ অঞ্চলের আদিবাসী তুঙ্গাস, নানাই জাতিগোষ্ঠীর সাথে মিশেছেন। নিবিড়ভাবে অবলোকন করেছেন তাদের জীবনধারা, তাইগা'র অরণ্যকে ভালোবেসেছেন। এ অঞ্চলে থাকাকালীন সময়ে'সাইবেরিয়ান লাইটস' ম্যাগাজিনে লিখেছেন অসংখ্য উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। তিনি শিশু ও কিশোরসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম 'ডিঙ্গো : স্টোরি অফ ফার্স্ট লাভ'। এটির উপর ভিত্তি করেপরবর্তীতে সিনেমা নির্মিত হয়েছিল।বেশ জনপ্রিয়তা পায় সিনেমাটি।

রুভিম ফ্রেয়ারম্যান সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিকজীবনের বন্ধু সোভিয়েত কথাসাহিত্যিক কন্সতান্তিন পাউস্তোভস্কি ও আর্কাদি গাইদার।